প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৩৬১

প্রচ্ছদ :
জোছন দস্তিদার

জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলি-৯ হইতে
এস. দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও কানাইলাল ঘোষ বীণাপাণি প্রেস
১।১এ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট কলিকাতা-৬ কর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

—**বিমল**

অভিনয়ের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির তালিকা

মঞ্চে—ড্রইংরুমের সেট। দুইটি single সোফা, একটি double seat-এর সোফা। একটি ছোট গোল টেবিল এবং টেবিল ঢাকার একটি চাদর। একটি ফুলদানি এবং কিছু রজনীগন্ধা, একটি suggestive ক্যালেণ্ডার। একটি টেলিফোন। একটি ছাই দান। একটি লেখার প্যাড। একটি টেবিল এবং তার চাদর। দরজা ও জানালার পর্দা। এছাড়া ড্রইংরুম সাজাতে যা কিছু দরকার যেমন, ফুলের টব, টেবিলল্যাম্প, ইজিচেয়ার ও কিছু ছবি প্রভৃতি পরিচালক ইচ্ছা করলে রাখতে পারেন।

চরিত্র চিত্রণে :—

বিকাশ॥ ধুতি, পাঞ্জাবী, সিগারেট কেস, passport, identity card, একটি রিভলবার ও একটি কলম।

প্রকাশ॥ স্যুট, সিগারেটের টিন, দেশলাই, একটি রুমাল, একটি ছোট চিঠি ও একটি রিভলবার।

নবেন্দু॥ ইনস্‌পেক্টারের পোষাক।

নকলু॥ মদের বোতল, গ্লাস, ট্রে, তোয়ালে।

হরেন॥ দু'কাপ কফি, দু'গ্লাস জল, দুটো প্লেট, একটি ট্রে, দুটো ডিস ও দুটো প্যাটিস্‌, ও তোয়ালে।

ঃ চরিত্র ঃ

বিকাশ—ইনস্‌পেক্টর হিমাংশু গাঙ্গুলী, ছদ্মবেশে প্রকাশের দাদা।

প্রকাশ—ধনীর সন্তান।

নবেন্দু—বড়তলা থানার সাব্‌ ইনস্‌পেক্টর।

নকলু—পুলিশ অফিসার, ছদ্মবেশে প্রকাশের চাকর।

হরেন—বিকাশের চাকর।

গোবিন্দ—প্রকাশের মোসাহেব।

১৮ই মে ও ৬ই জুলাই বিশ্বরূপা গিরিশ একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতায় বহুমুখীর প্রযোজনায় যে সমস্ত শিল্পীগণ অভিনয় করে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন :—

বিকাশ—বিদ্যুৎ গোস্বামী

প্রকাশ—সুভাষ আচার্য

নবেন্দু—অনিল চ্যাটার্জী

নকলু—নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায়

হরেন—সন্তোষ দাস

গোবিন্দ—ননী হালদার

পরিচালনা—**বিদ্যুৎ গোস্বামী**

যারা অভিনয় করে প্রথম পুরস্কার লাভ করেছিল।

প্রকাশ—বিমল রায়

বিকাশ—অজয় সরকার

নবেন্দু—অরুণ দাশগুপ্ত

গোবিন্দ—নগেন চক্রবর্তী

নকলু—বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

হরেন—সুধীর গুহ

পরিচালনা—**বিমল রায়**

নেপথ্য সহযোগিতায় :

সর্বশ্রী তপন ঘোষ, অজিত সেনগুপ্ত, সুনির্মল বসু, তপন দাশগুপ্ত, সুশান্ত ঘোষ, নির্মল চৌধুরী, সুবোধ মুখোপাধ্যায়।

[ড্রইং রুম। বড়লোকী কায়দায় সাজান। পর্দা উঠলে স্টেজ অন্ধকার দেখা যায়। বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ শোনা যায়। নকলু ঢুকে সুইচ্ টিপে আলো জ্বালায়। একটা গেঞ্জি গায়ে দিতে দিতে দরজা খুলতে পর্দার বাইরে চলে যায়। প্রকাশ ঢোকে। স্যুট পরা। হাতে সিগারেটের টিন, চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ। সেটের পাশে টেবিলের ওপর সিগারেটের টিনটি রাখে। দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডারের প্রতি চোখ পড়তেই সেদিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। ক্যালেণ্ডারটি significant হওয়া আবশ্যক। নকলু প্রকাশকে মুহূর্তকাল লক্ষ্য করে। তারপর বলে]

নকলু ॥ আজ আপনি এত তাড়াতাড়ি ফেরলেন বাবু? শরীরটা কি আজ আপনার ভাল নেই? (কোনও উত্তর না পেয়ে) বাবু—

প্রকাশ ॥ এঁ্যা—

নকলু ॥ শরীরটা কি ভাল নেই?

প্রকাশ ॥ হুঁ—

নকলু ॥ (প্রকাশের গা থেকে কোট খুলতে খুলতে) শরীরের আর দোষ কি! ডাক্তার এত করি মানা করে, আপনি তবু ঐ সব ছাই পাঁশ খান্। এত অত্যাচার করলি পর আপনি যে আবার অসুখে পড়বেন বাবু।

প্রকাশ ॥ (সোফায় বসতে বসতে) মনিকা এসেছিল?

নকলু ॥ আজ্ঞা না।

প্রকাশ ॥ ক্লাবের ড্রেস্‌টা ঠিক করে রাখ। আমাকে বেরুতে হবে।

নকলু ॥ আজ আর না বেরুলেন বাবু। শরীর খারাপ একটু শুয়ে থাকুন।

প্রকাশ ॥ দরজাটা খুলে দে—(নকলু গিয়ে দরজা খুলে ফিরে আসে। গোবিন্দ ঢোকে)

গোবিন্দ ॥ আপনি চলে এলেন, নাইট ক্লাবে যাবেন না স্যার ?

[নকলু ফুলদানিতে পাশেই রাখা রজনীগন্ধা সাজাতে থাকে]

প্রকাশ ॥ শরীরটা ভাল নেই।

গোবিন্দ ॥ সে কি ? তাহলে ক্লাবে যাবেন না ?

প্রকাশ ॥ না-না ক্লাবে যাব। (সোফা থেকে উঠতে উঠতে) আপনি মনিকার বাড়ী চেনেন ?

গোবিন্দ ॥ মনিকা দেবী ? কেন চিনবো না ! নিশ্চয়ই চিনি। বিলক্ষণ চিনি। যেতে হবে স্যার ?

[গোবিন্দ তড়িৎগতিতে চলে যেতে থাকে]

প্রকাশ ॥ হ্যাঁ—আর শুনুন— সব কথা না শুনেই চলে যাচ্ছেন যে ?

গোবিন্দ ॥ বলুন স্যার—

প্রকাশ ॥ ম'নকাকে বলবেন সে যেন প্রস্তুত থাকে। তাকে নিয়ে আজ আমি ক্লাবে যাব। (গোবিন্দ প্রকাশের দিকে বিস্ময়ে তাকায়) হ্যাঁ, তাকে নিয়েই যাব।

গোবিন্দ ॥ ঠিক আছে স্যার। আমি এখুনি যাচ্ছি। আপনি কিন্তু দেরী করবেন না স্যার। [গোবিন্দ চলে যায়। নকলু ঘরেই ছিল, ওদের কথাবার্তা শুনছিল। গোবিন্দ চলে গেলে দরজা বন্ধ করে দেয়]

বিকাশ ॥ (নেপথ্যে) হরেন—হরেন, এই ঘরটা···হ্যাঁ হ্যাঁ, এই ঘরটা পরিষ্কার কর, ভালো করে করবি বুঝলি ?

[ভিতরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় প্রকাশ]

প্রকাশ ॥ নকলু—

নকলু ॥ বলেন বাবু—

প্রকাশ ॥ ভেতরে কে কথা বলছে ?

নকলু ॥ ওহো—আপনাকে বলতি ভুলি গেছি বাবু—আপনার দাদা এসেছেন।

প্রকাশ ॥ কি ? কে এসেছে বললি ?

নকলু ॥ আপনার দাদা।

প্রকাশ ॥ আমার দাদা ! (বিকাশ ঢোকে। পাঞ্জাবী ও ধুতি পরা)

বিকাশ ॥ এই যে নিতু, কেমন আছিস ?

[বিকাশ একটা সিগারেট ধরায়। নকলু ভেতরে যায়। বিকাশ সোফায় বসে। প্রকাশ হতভম্বের মত বিকাশের দিকে তাকায়।]

কতদিন বাদে এলাম। বাড়ীটা, অনেক রিপেয়ার করেছিস দেখলাম। কিন্তু আমি যে ঘরটাতে শুতাম সেটা দেখলাম খুব নোংরা হয়ে আছে। আমার সঙ্গে একটা চাকর এসেছে। তাকে বলেছি পরিষ্কার করতে। অবশ্য বেশীদিন আমার থাকা চলবে না। কাল পরশুই চলে যেতে হবে। কি রে ? হাঁ করে এমনভাবে তাকিয়ে আছিস যেন আমাকে চিনতেই পারছিস না।

প্রকাশ ॥ সত্যি আপনাকে চিনতে পারছি না।

বিকাশ ॥ মানে ?

প্রকাশ ॥ কে আপনি ?

বিকাশ ॥ তুই আমাকে চিনতে পারছিস না ?

প্রকাশ ॥ আপনি করে বলুন। কি চাই আপনার ?

বিকাশ ॥ এই ক'দিনে তোর এত পরিবর্তন হয়েছে, যে বড় ভাইকে তুই অস্বীকার—

প্রকাশ ॥ থামুন! আমার দাদা নেই। দু'বছর আগে তিনি ট্রেণ এ্যাক্সিডেন্ট-এ মারা গেছেন। হি ইজ ডেড্।

বিকাশ ॥ তা হলে আমি কে? তার প্রেতাত্মা?

প্রকাশ ॥ আপনি কেউ নন। আমার দাদাও নন, তাঁর প্রেতাত্মাও নন। কিন্তু চালে বড্ড ভুল করে ফেলেছেন। ভুলটা আমি শুধরে দিচ্ছি। (প্রকাশ টেলিফোন ডায়েল করতে থাকে)

বিকাশ ॥ নাঃ, আমারই দেখছি ভুল হয়েছে। না আসাই ছিল ভাল। অভ্যর্থনা দূরে থাক—

প্রকাশ ॥ আপনাকে অভ্যর্থনার ব্যবস্থাই করছি। (ফোনে-এ) হ্যালো, সারকুলার! পুট মি টু বড়তলা পুলিশ স্টেশন।

বিকাশ ॥ পুলিশ! এই…এই নিতু—কি হচ্ছে ছেলেমানুষী?

[দৌড়ে গিয়ে ফোনটা চেপে ধরে]

প্রকাশ ॥ পুলিশ ডাকছি আপনাকে অভ্যর্থনা করবাষ জন্যে।

বিকাশ ॥ (রেগে) পুলিশ এসে বলবে আমি তোর দাদা বিকাশ মুখোপাধ্যায়—তবেই স্বীকার করে নিবি? আমাদের বংশের মর্যাদা আভিজাত্য সব কিছুই তুই ভুলে গেলি?—আশ্চর্য!

প্রকাশ ॥ সত্যি আশ্চর্য আপনার অভিনয়!

বিকাশ ॥ অভিনয়?

প্রকাশ ॥ নয়?

বিকাশ ॥ কি বলতে চাস তুই?

প্রকাশ ॥ বেরিয়ে যান আপনি।

বিকাশ ॥ নাঃ! দেখনি ছোটবেলাকার তোর সেই হঠাৎ রেগে যাওয়া স্বভাবটা এখনও যায়নি। (বসতে বসতে) তোর এই হঠাৎ রেগে যাওয়ার জন্য আমাকে কত লোকের সঙ্গে ঝগড়া করতে হত।

প্রকাশ ॥ বাজে কথা না বলে আপনি বেরিয়ে যাবেন কিনা বলুন?

বিকাশ ॥ হোয়াই ?

প্রকাশ ॥ বিকজ ইউ আর নট মাই ব্রাদার।

বিকাশ ॥ দেন হু অ্যাম আই ?

প্রকাশ ॥ আই ডোণ্ট ওয়াণ্ট টু নো হু ইউ আর। (কণ্ঠস্বর নামিয়ে) আমার দাদা ট্রেণ এ্যাক্সিডেণ্ট-এ মারা গেছেন। হি ইজ ডেড্। আমি নিজে গিয়ে ডেড্ বডি সনাক্ত করেছি।

বিকাশ ॥ (স্বাভাবিকভাবে) তা ঠিক। কিন্তু সেটা এই বিকাশ মুখোপাধ্যায়ের ছিল না।

প্রকাশ ॥ মিথ্যে কথা। আমার দাদাকে চিনতে আমি ভুল করিনি। দাদার ডেড বডি সনাক্ত করে নিজে আমি সেই বডি শ্মশানে নিয়ে গেলাম। নিজের হাতে আগুন জ্বালিয়ে দিলাম। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। আমি দেখলাম তার মুখখানা ··হ্যাঁ, মুখখানা তার মুহূর্তের মধ্যে বিকৃত হয়ে গেল। তারপর ধীরে ধীরে সমস্ত বডি শেষ হয়ে গেল।

[চীৎকার করে হেসে ওঠে বিকাশ]

বিকাশ ॥ তোর কথা শুনে রিয়েলি আমার হাসি পাচ্ছে। জল-জ্যান্ত মানুষটা আমি তোর সামনে দাঁড়িয়ে, আর তুই কিনা আমার ডেড বডি পুড়িয়ে এলি ! ইট ইজ রিয়েলি এ ফান।

প্রকাশ ॥ নো, ইটস্ নট এ ফান। ইটস্ এ ফ্যাক্ট। আপনি আমার দাদা বিকাশ মুখোপাধ্যায় তাই না ?

বিকাশ ॥ তুই অস্বীকার করলেও আমার জন্ম ইতিহাস অবশ্য সে কথা স্বীকার করে।

প্রকাশ ॥ বলুন তো, আমার দাদার হবি কি ছিল ?

বিকাশ ॥ তুই কি ভুলে গেলি মোটর ড্রাইভিং কম্পিটিশন-এ কতবার ফার্স্ট হয়ে তোকে আমি প্রাইজ এনে দিয়েছি। তোকে নিয়ে রোজ

সকালে মোটর ড্রাইভিং-এ বেরুতাম। তাছাড়া এ সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিয়ে কি প্রমাণ করতে হবে যে আমি তোর দাদা! (চেয়ার থেকে উঠতে উঠতে) হতে পারে বাবা বিরাট সম্পত্তি রেখে মারা গেছেন, ব্যাঙ্কে আমাদের প্রচুর টাকা। তুই যদি ভেবে থাকিস তাতে ভাগ বসাতে এসেছি তাহলে খুব ভুল করেছিস। টাকার আমার দরকার নেই। টাকা আমি যথেষ্ট রোজগার করি।

[হরেন ঢোকে। চাকরের পোষাক পরিহিত। হাতে একটা তোয়ালে। হাত মুছতে মুছতে বলে]

হরেন ॥ বাবু, আপনার ঘরটা ধোয়া হয়ে গেছে। আমি কোন্ ঘরটাতে থাকব বলুন—সেটাও আমি ধুয়ে রাখি।

বিকাশ ॥ এই আমার চাকর হরেন। (হরেনকে) নিতু আমার ছোট ভাই। প্রণাম কর।

[হরেন প্রণাম করতে যায়]

প্রকাশ ॥ থাক্—। ওঃ, তাহলে বেশ প্ল্যান করেই আসা হয়েছে !

বিকাশ ॥ (এগিয়ে এসে) চাকর বাকরের সামনে কি সব বাজে কথা বলছিস ? (হরেনকে) চল হরেন—

[বিকাশ ও হরেন চলে যেতে থাকে]

প্রকাশ ॥ দাঁড়ান (উভয়েই ঘুরে দাঁড়ায়) ভেবেছেন কি ? জিজ্ঞাসা করছি আপনি ভেবেছেন কি ? কোন্ সাহসে আপনি ভেতরে ঢুকছেন ?

বিকাশ ॥ (অভিভাবকের মতো) ত্থাখ নিতু, প্রত্যেক জিনিসেরই একটা লিমিট আছে। তাকে ছাড়িয়ে যাওয়া আদৌ ভাল নয় বুঝলি ? আয় হরেন—

[উভয়েই ভিতরে চলে যায়, প্রকাশ কিছুক্ষণ চিন্তা করে টেলিফোন-এর দিকে তাকিয়ে তারপর ফোন তুলে ডায়াল করে]

প্রকাশ॥ হ্যালো সারকুলার! পুট মি টু বড়তলা পুলিশ স্টেশন। কে কথা বলছেন? নবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে একবার দিন তো। খুব দরকার ...কে নবেন্দু? আমি প্রকাশ। খুব বিপদে পড়েছি ভাই। তোমায় এখুনি একবার আসতে হবে। এ্যাঁ? হ্যাঁ, হ্যাঁ এখুনি। সে অনেক কথা। ফোনে বলা যাবে না। এ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ—আচ্ছা। (ফোন রেখে নিঃশ্বাস ফেলে) নকলু—নকলু—

[নকলু ঢোকে]

নকলু॥ কি বোলতিছেন বাবু—

প্রকাশ॥ ছাখ—লক্ষ্য রাখবি—যারা এসেছে তারা যেন আমার কোন কিছুতে হাত না দেয়।

নকলু॥ আচ্ছা বাবু— [প্রস্থানোদ্যত]

প্রকাশ॥ আর শোন্, লোকটার সঙ্গে যে চাকর এসেছে সে তোর কাছে যদি থাকতে চায়, বলবি আমার বারণ আছে।

নকলু॥ তাই হবে বাবু। (নকলু চলে যায়। বিকাশ ঢোকে)

বিকাশ॥ জানিস নিতু, আমার চাকরটা খুব ভাল কফি করতে পারে। বলে এলাম দু'কাপ করতে। (চেয়ারে বসে একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে) তুই যে ট্রেণ এ্যাক্সিডেন্ট-এর কথা বলছিলি না, ও ট্রেণ-এ আমার থাকবার কোন কারণই নেই, কেননা আমি তখন পোল্যাণ্ডে।

প্রকাশ॥ মিথ্যে কথা।

বিকাশ॥ আহা! রাগছিস কেন? ঐ ট্রেণ-এ আমার একজন বন্ধু ছিল সে তোকে চেনে। সে দেখলো তুই আর এক জনের ডেড্ বডি পুলিশের কাছে আমার ডেড্ বডি বলে সনাক্ত করলি। বন্ধুর কাছে কথাটা শুনে আমি খুব শক্ পেয়েছিলাম। (চেয়ার ছেড়ে উঠে) মনে হয়েছিল ছোটবেলায় যাকে এত আদর, এত স্নেহ করেছি আর সে

কিনা....তাই আমি এত দিন আর আসিনি। ভেবেছিলাম কোন দিন আসবো না। কিন্তু পারলাম না। আচ্ছা নিতু, বাবা মারা যাবার সময় কোন উইল করে গেছেন ?

প্রকাশ ॥ দেখুন ! যে মতলবেই এসে থাকুন খুব অসুবিধে হবে না।

বিকাশ ॥ তোর রাগটা এখনও কমেনি দেখছি। আচ্ছা পাখী মারার অভ্যেস টভ্যেসগুলো তোর এখনো আছে—না, ছেড়ে দিয়েছিস ?

প্রকাশ ॥ অভিনয়ের কলা কৌশল সত্যি আপনার অপূর্ব। তবে ভিতটা একটু কাঁচা।

বিকাশ ॥ তার মানে ?

প্রকাশ ॥ ধ্বসে যাবে।

[হরেন দু'কাপ কফি একটা ট্রেতে নিয়ে ঢোকে]

হরেন ॥ বাবু, কফি—

বিকাশ ॥ রাখ। ভাল করেছিস তো ? আয় নিতু, খেয়ে বল কেমন হয়েছে।

প্রকাশ ॥ আমাকে আপনি নিতু বলে ডাকবেন না। প্রকাশবাবু বলবেন। আর কফি আমি খাব না।

বিকাশ ॥ তুই যা হরেন। (হরেন চলে যায়) আচ্ছা, তুই একটা জিনিস বুঝছিস না কেন যে—

প্রকাশ ॥ ফর গড্স সেক, যা কিছু বলবার আপনি পুলিশকেই বলবেন।

বিকাশ ॥ পুলিশ ? তুই পুলিশে খবর দিয়েছিস ? শেম নিতু ! ইউ শুড ফীল এ্যাশেম্ড, ছিঃ ছিঃ ! আমি তো বললাম কালই আমি চলে যাব। অন্দর মহলে পুলিশ ডেকে এভাবে বংশের মান সম্মান নষ্ট না করলেও চলতো। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, আমার আসাটাই ভুল হয়েছে।

[নবেন্দু ঢোকে, দারোগার পোষাক পরিহিত]

নবেন্দু॥ প্রকাশ—

প্রকাশ॥ নবেন্দু এসে গেছ।

নবেন্দু॥ কি ব্যাপার বল ত?

প্রকাশ॥ আমার নাকি দাদা এসেছেন!

নবেন্দু॥ দাদা!

প্রকাশ॥ হ্যাঁ!

নবেন্দু॥ তুমি যে বলেছিলে তোমার দাদা ট্রেণ এ্যাক্সিডেন্ট-এ মারা গেছেন?

বিকাশ॥ ও অবশ্য তাই জানতো।

প্রকাশ॥ চুপ করুন। নবেন্দু বুঝতে পারছো না, হি ইজ এ চীট।

বিকাশ॥ নিতু!

প্রকাশ॥ শাট আপ? এজন্যেই তোমাকে ডেকেছি নবেন্দু।

নবেন্দু॥ ঠিক আছে আমি দেখছি। [নবেন্দু বিকাশের কাছে এগিয়ে যায়] দেখুন, আপনার যদি কোনও আপত্তি না থাকে আমি আপনাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।

বিকাশ॥ বেশ তো করুন না।

নবেন্দু॥ আচ্ছা, এর আগে ত আপনাকে কখনো দেখিনি?

বিকাশ॥ এর আগে মানে? কি বলতে চান?

নবেন্দু॥ মানে, বছর দুই প্রকাশের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। তার মধ্যে আপনাকে আমি কোনদিন দেখিনি।

বিকাশ॥ বছর তিনেক আমি পোল্যাণ্ড-এ। বাই দি বাই, আপনি, বুঝি পুলিশ অফিসার?

নবেন্দু॥ হ্যাঁ, আমি এখানকার এস্ আই।

বিকাশ ॥ নমস্কার। বসুন।

[দু'জনেই সোফায় বসে]

নবেন্দু ॥ নমস্কার। পোল্যাণ্ড-এ আপনি কি করতেন ?

বিকাশ ॥ সেখানে আমি একটা ফ্যাক্টরির চীফ ইঞ্জিনিয়ার। আমি লাষ্ট এখানে এসেছি ঠিক দু'বছর পাঁচ মাস আগে। প্রকাশ যে ট্রেণ এ্যাক্সিডেণ্ট-এর কথা বলেছে আমি তখন পোল্যাণ্ড-এ। আমাদের ফ্যাক্টরি থেকে একটা জরুরী চিঠি পেয়ে ঐ ট্রেণ এ্যাক্সিডেণ্ট-এর ঠিক আগের দিনই আমি প্লেনে পোল্যাণ্ড চলে যাই। খবরের কাগজে অবশ্য এ্যাক্সিডেণ্ট-এর খবরটা আমি পড়েছিলাম।

নবেন্দু ॥ আপনার পাশপোর্টটা দেখাতে পারেন ?

বিকাশ ॥ অব কোর্স ! (বিকাশ ভিতরে যায়)

নবেন্দু ॥ (চুপি চুপি) তোমার দাদার কোন ছবি আছে ?

প্রকাশ ॥ ছিল। কিন্তু আমার মূর্তিমান চাকরটা সব নষ্ট করে ফেলেছে।

নবেন্দু ॥ দেখতে কেমন ছিল তোমার দাদা ?

প্রকাশ ॥ এর চেহারার সঙ্গে অনেকটা মিল আছে।

নবেন্দু ॥ শোন। তোমার দাদার হাতের লেখা কোন চিঠি আছে ?

প্রকাশ ॥ হাঁ—আছে।

নবেন্দু ॥ নিয়ে এসো।

[প্রকাশ চলে যায়। বিকাশ ঢোকে। নবেন্দু পাশপোর্টট দেখে। দেখার পর নবেন্দু ফেরৎ দিয়ে দেয়]

এক্সকিউজ মি। ইওর পাশপোর্ট ইজ অলরাইট। আই হ্যাভ

নাথিং টু সে এগেনষ্ট ইট। হয়তো আপনি সত্যিই প্রকাশের দাদা। কিন্তু আমরা পুলিশের লোক। উই রিকোয়ার মোর এভিডেন্স এণ্ড প্রুফ—বিশেষ করে প্রকাশ যখন একেবারেই অস্বীকার করছে আপনাকে।

বিকাশ॥ আরও পরীক্ষা দিতে হবে বুঝি? (পাশপোর্টটা রেখে এসে) ওর এই একগুঁয়েমী স্বভাব ছোটবেলা থেকেই আর এর জন্য আমি ও বাবা সমানভাবে দায়ী।

প্রকাশ॥ (নেপথ্যে) নকলু—নকলু—এখানে এই ফাইলের ভেতর থেকে চিঠিগুলো কোথায় গেল?

নকলু॥ তা আমি কি জানি বাবু?

প্রকাশ॥ তা আমি কি জানি? উল্লুক, বাঁদর কোথায়! লাথি মেরে বাড়ী থেকে বার করে দেবো।

বিকাশ॥ ঐ শুনুন! কি কাণ্ডটা বাধিয়েছে। ছোটবেলায় ওর ডান উরুতে একটা বাঁদর কামড়ে দিয়েছিল। একটা দাগ আছে দেখবেন। ডাক্তার বলেছিল হয়ত কোনদিন ওর মাথার গোলমাল হতে পারে। তা ও যে কাণ্ড করছে তাতে মনে হচ্ছে—

[প্রকাশ দ্রুত ঢোকে। হাতে একখানা ছোট চিঠি]

প্রকাশ॥ নবেন্দু! নবেন্দু! পেয়েছি একখানা। কিন্তু মাত্র দু' লাইন লেখা।

নবেন্দু॥ ওতেই হবে। দ্যাট উইল ডু।

[নবেন্দু চিঠিটা নেয়। অল্পক্ষণ কি যেন চিন্তা করে।]

দেখুন, আমি এই চিঠিটা ডিক্‌টেট করবো, আপনি লিখবেন।

প্রকাশ ॥ এবং সইটাও করতে হবে।

[প্রকাশের প্রতি বিকাশ কটাক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে]

বিকাশ ॥ আমি বুঝতে পারছি না এ সবের অর্থ কি?

প্রকাশ ॥ অর্থ কিছু বাদেই জানতে পারবেন!

বিকাশ ॥ অলরাইট, বলুন কি লিখতে হবে?

নবেন্দু ॥ আচ্ছা প্রকাশ, চিঠিখানা বিকাশবাবু কাকে লিখেছিলেন

প্রকাশ ॥ আমাকে।

নবেন্দু ॥ এই নামটা তা'হলে তোমার?

প্রকাশ ॥ হ্যাঁ—দাদা এবং বাবা আমাকে ঐ নামেই ডাকতেন।

বিকাশ ॥ নিতু নাম আছে বোধহয়। আমি আর বাবা ওকে আদর করে ঐ নামেই ডাকতাম। যাকগে বলুন, আমাকে কি লিখতে হবে!

[নবেন্দু চিঠিটা ডিক্‌টেট করে। বিকাশ লেখে]

নবেন্দু ॥ "স্নেহের নিতু! শুনলে তুই সবচেয়ে আনন্দ পাবি। আমি ফার্স্ট হয়েছি। বাবাকে খবরটা দিস। কাল বাড়ি পৌঁছাচ্ছি।

ইতি—

দাদা বিকাশ মুখোপাধ্যায়"

প্রকাশ ॥ (নবেন্দুকে চিঠিখানা দিতে দিতে) আমি যেবার ইন্টারন্যাশনাল ড্রাইভিং কম্পিটিশনে ফার্স্ট হয়েছিলাম সেবার, মানে সেই দিনেই ঐ চিঠিখানা নিতুকে লিখেছিলাম।

[চিঠিখানা হাতে করে নবেন্দু চেয়ার ছেড়ে সরে আসে। দু'খানা চিঠি পাশাপাশি রেখে আপন মনে বলে]

বেন্দু ॥ একই সই! একই হাতের লেখা!

কাশ ॥ বাট ষ্টিল হি ইজ নট মাই ব্রাদার।

[নবেন্দু বিকাশের কাছে এগিয়ে যায়। বিকাশ সিগারেট কেস থেকে নবেন্দুকে একটা অফার করে।]

ন্দু ॥ নো, থ্যাঙ্কস।

কাশ ॥ এ সিগারেট কেস আপনি কোথায় পেলেন ?

কাশ ॥ কোথায় পেলাম মানে ?

কাশ ॥ এটা আমার দাদার সিগারেট কেস।

কাশ ॥ তুই কি ভুলে গেলি, আমার নাম মনোগ্রাম করে কেসটা তুই-ই আমায় প্রেজেণ্ট করেছিলি ?

[নবেন্দু সিগারেট কেসটা হাতে নিয়ে একবার দেখে। সে অনেকটা কনভিন্সড্ যে বিকাশবাবুই প্রকাশের আসল দাদা]

ন্দু ॥ বিকাশবাবু, আই অ্যাম সরি ফর গিভিং ইউ আননেসেসারি ট্রাবল্স্।

কাশ ॥ নবেন্দু! বিশ্বাস কর এ আমার দাদা নয়।

ন্দু ॥ প্রকাশ! আমি বুঝতে পারছি না—কি দরকার ছিল এ সমস্ত রসিকতা করবার ?

কাশ ॥ নবেন্দু! তুমি আমায় ভুল বুঝনা। ডোণ্ট ডিসবিলিভ মি। (হঠাৎ মনে পড়তে) নবেন্দু, আর একটা কথা মনে পড়েছে, আমার দাদার বাঁ-হাতের ওপর একটা উল্কি ছিল, সেটা দেখাক।

[বিকাশ প্রকাশের উপর কটাক্ষপাত করে]

বিকাশ ॥ আর কত অপমান তুই আমায় করবি বলতো ?

প্রকাশ ॥ কোন কথা আপনার শুনতে চাই না। শো দ্যাট মার্ক

[বিকাশ জামার হাতা গুটিয়ে উল্কিটা নবেন্দুকে দেখায় ;
প্র কাশ এগিয়ে এসে দেখে চমকে ওঠে]

বিকাশ ॥ (রীতিমত রেগে) শেম্ ইউ অট টু ফিল অ্যাসেমড্ ফ
দিস। (রেগে ভিতরে চলে যায়। নবেন্দুও চলে যেতে থাকে

প্রকাশ ॥ না-না, তুমি চলে যেওনা নবেন্দু।

নবেন্দু ॥ এর পরেও থাকার কি দরকার আছে ?

প্রকাশ ॥ কি বলছ তুমি ?

নবেন্দু ॥ কেন তুমি নিজের দাদাকে অস্বীকার করছ ?

প্রকাশ ॥ নবেন্দু, তুমিও—

নবেন্দু ॥ হ্যাঁ—

প্রকাশ ॥ কিন্তু—

নবেন্দু ॥ কি ?

প্রকাশ ॥ না—কিছু না।

[প্রকাশ সরে এসে সোফার পাশে দাঁড়ায়। নবেন্দু কা
এগিয়ে এসে—]

নবেন্দু ॥ হি ইজ নোবডি বাট বিকাশ মুখোপাধ্যায়।

প্রকাশ ॥ নো!

নবেন্দু ॥ ইয়েস, হি ইজ ইওর ব্রাদার।

প্রকাশ ॥ আই এ্যাম হেল্পলেস নবেন্দু, আই এ্যাম হেল্পলেস, আ
তোমাকে বোঝাতে পারবো না যে ইট ইজ গ্রেট কন্স্পিরে
—একটা বিরাট····বিরাট ষড়যন্ত্র।

নবেন্দু ॥ দেখ, আমি পুলিশের লোক। আই ক্যান্‌ট বি ইল্লিগ্যাল —আমি প্রমাণ ছাড়া কিছু করতে পারি না।

প্রকাশ ॥ কিন্তু বিশ্বাস কর—লোকটা যা বলছে যা দেখাচ্ছে সব ফল্‌স, সব মিথ্যে—

নবেন্দু ॥ বাট হাউ, হাউ ইউ ক্যান সে দ্যাট?

প্রকাশ ॥ কিন্তু পুলিশের লোক হয়ে তোমার অন্ততঃ এটা বোঝা উচিত, লোকটা একটা চীট····এসেছে আমার সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করতে।

নবেন্দু ॥ আমি যদি বলি তুমিই সম্পত্তির লোভে তোমার দাদাকে অস্বীকার করছো?

প্রকাশ ॥ (চীৎকার করে) দেন কাণ্ট হেল্‌প্‌····আই মাস্ট··· (গলা নামিয়ে) আমার মাথা ঘুরছে নবেন্দু, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমিও আমার বিপদটাকে বুঝতে চাইছো না!

নবেন্দু ॥ এটা সেণ্টিমেণ্টের ব্যাপার নয় প্রকাশ। আমি বুঝতে পারছি না কিসের জন্য তুমি তোমার দাদাকে অস্বীকার করছো।

প্রকাশ ॥ বিকজ হি ইজ নট মাই ব্রাদার!

নবেন্দু ॥ তোমার দাদাকে আমি কখনও দেখিনি। চেহারার দিক থেকে তুমি একে দাদা অস্বীকার করতে পার?

প্রকাশ ॥ না!

নবেন্দু ॥ বাঁ-হাতে একটা উল্কি আছে সেটার কথা তুমিই জানতে। সেটা মিলেছে?

প্রকাশ ॥ হ্যাঁ!

নবেন্দু ॥ আমি এতদিন তোমার সঙ্গে মিশছি। তোমার জান

উরুতে একটা পাগলা বাঁদরে কামড়ে দিয়েছিল—তার দাগ আছে—

প্রকাশ ॥ সে কথা জানলে কেমন করে ?

নবেন্দু ॥ আমি জানতাম না—উনি বললেন।

প্রকাশ ॥ আশ্চর্য নবেন্দু—আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না কেমন করে লোকটা আমার সব খবর জেনেছে।

নবেন্দু ॥ তারপর হাতের লেখা, হাতের সই, এমন কি তোমার প্রেজেন্ট করা সেই সিগারেট case, সবই তুমি চিনতে পারছ। সবচেয়ে বড় কথা একই রকম চেহারা। তা হলে ?

প্রকাশ ॥ তা হলেও এ আমার দাদা নয়। নো, নো, নো—

নবেন্দু ॥ তা হলে তুমি কেস কর। তোমার হয়ে কোর্ট প্রমাণ করবে—ইনি তোমার দাদা নন—অবশ্য তোমার কথা যদি সত্য হয়।

প্রকাশ ॥ না—না, কেস আমি করতে চাই না। সে অনেক বিশ্রী ব্যাপার নবেন্দু।

[বিকাশ ঢোকে হাতে একটা রিভলবার]

বিকাশ ॥ নিতু—লোড করা রিভলবার বালিশের নীচে রাখার জন্য বাবা কতদিন তোকে বকেছেন—এখনও তোর সেই সাংঘাতিক অভ্যেসটা গেল না ?

প্রকাশ ॥ আশ্চর্য ! (রিভলবারটা ছিনিয়ে নিয়ে) এখনই আপনি আমার উপর কর্তৃত্ব শুরু করেছেন ? কেন আমার জিনিসে আপনি হাত দিয়েছেন ? হোয়াই ? নকুল—নকুল—

[ভিতরে গিয়ে নকুলকে গালমন্দ করে]

(নেপথ্যে) তোকে আমি বলেছিলুম না, আমার জিনিসে কেউ যেন হাত না দেয় !

কল্লু ॥ (নেপথ্যে) আজ্ঞে আমি ত বারণ করেছিলুম—আমার কথা যে—

প্রকাশ ॥ (নেপথ্যে) কেন সেকথা আমায় বলিস্‌নি—পাজী, হতচ্ছাড়া, বাঁদর—

বিকাশ ॥ দেখুন কি ধরনের বদ্‌মেজাজী ছেলে। আপনি জানেন না আমার বাবা বালিশের নীচে লোড করা রিভলবার রাখতেন বলে আমাদের কি ভীষণ সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমাদের একটা মাত্র বোন ছিল, সে বাবার কাছেই শুতো। এই ঘরটার ঠিক ওপরের ঘরটাতে বাবা শুতেন। একদিন সকালে বাবা যখন ঘুম থেকে উঠে বাইরে গেছেন—আমার ছোট বোনটি রিভলবারটি বালিশের নীচে থেকে বের করে খেলা করতে করতে একটা গুলি বেরিয়ে এসে একেবারে সোজা তার বুকে।

নবেন্দু ॥ কি সর্বনাশ ! তারপর ?

বিকাশ ॥ ফিনিশড্‌ !

নবেন্দু ॥ ইট'স্‌ এ স্যাড নিউজ, কিন্তু প্রকাশ ত কোনও দিন আমাকে এ খবর বলেনি !

বিকাশ ॥ হয়তো সুযোগ পায়নি—তাই বলেনি। সেদিন থেকে বাবা বালিশের নীচে রিভলবার রাখা বন্ধ করলেন। কিন্তু নিতু রাখত বলে বহুদিন বাবা ওকে গালমন্দ করেছেন। তবু এখনও সেই কাজই করে চলেছে নিতু—

[নবেন্দু বিকাশের পরিচয় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে—হাতের ঘড়ি দেখে]

নবেন্দু ॥ অনেক দেরী হয়ে গেল। আমার আবার ডিউটি আছে। আমি চলি—নমস্কার—

বিকাশ ॥ সেকি! নিতুর সঙ্গে দেখা করে যাবেন না? আমি ডেকে দিচ্ছি। নিতু—নিতু—

[ডাকতে ডাকতে ভিতরে চলে যায়। প্রকাশ ঢোকে]

প্রকাশ ॥ (ঢুকেই) তুমি চলে যাচ্ছ নবেন্দু?

নবেন্দু ॥ হ্যাঁ।

প্রকাশ ॥ কিন্তু—

নবেন্দু ॥ দেখ প্রকাশ, আমার কোন সন্দেহই নেই যে ইনিই তোমার দাদা।

প্রকাশ ॥ নবেন্দু— ?

নবেন্দু ॥ কেন তুমি এঁকে মেনে নিচ্ছ না, প্রকাশ?

প্রকাশ ॥ আঃ, কেন তুমি বুঝতে চাইছনা, যে, হি ইজ ট্রাই টু কীল মি। আমাকে মেরে আমার সম্পত্তি গ্রাস করতে চায়। তুমি—তুমি আমায় বাঁচাও নবেন্দু। এ সময়ে তুমি আমায় ভুল বুঝো না।........তুমি আমায়...আর কি দিয়েই বা আমি তোমায় বিশ্বাস করাব! ঐ লোকটার কথায়, ঐ চীটটার কথায় তুমি যে একেবারে কন্‌ভিন্‌স্‌ড হয়ে গেছ!

নবেন্দু ॥ (ঘড়ি দেখে) অনেক দেরী হয়ে গেল।—চলি।

প্রকাশ ॥ আমার ভয় করছে নবেন্দু!

নবেন্দু ॥ ভয়ের কিছু নেই। দরকার হলে থানায় ফোন কোরো। আজ ত আমার নাইট ডিউটি।

[নবেন্দু চলে যায়, বিকাশ ঢোকে]

বিকাশ ॥ তোর বন্ধু বুঝি চলে গেল ?

প্রকাশ ॥ কি চাই ? কি চাই আপনার ? কেন এইভাবে আমার সঙ্গে শত্রুতা করছেন ? আপনি কে ?

বিকাশ ॥ স্ট্রেঞ্জ !

প্রকাশ ॥ (বিনয়ের সুরে) কত টাকা— কত টাকা চাই আপনার বলুন ? আমি চেক দিয়ে দিচ্ছি। প্লীজ—আপনি চলে যান—

বিকাশ ॥ কি সব পাগলামী করছিস নিতু ? বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে না কি ? আমি ত' প্রথমেই বলেছি আমি সম্পত্তির টানে আসিনি। আমি একমাত্র তোর টানেই এসেছি।

প্রকাশ ॥ প্লীজ—প্লীজ লিভ মী এ্যালোন !

বিকাশ ॥ ঠিক আছে।

[বিকাশ ভিতরে যায়, নকুল ঢোকে]

নকুল ॥ বাবু, এখন কি আপনাকে খাতি দেব ? রাত ত অনেক হলো।

প্রকাশ ॥ (চীৎকার করে) বেরিয়ে যা—বেরিয়ে যা তুই। তোকে আর আমার দরকার নেই।

নকুল ॥ আমি আবার কি কল্লাম ?

প্রকাশ ॥ কিছুই করনি ! আর কিছু করার—

[হঠাৎ মাথা ঘুরে যায়। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে]

নকুল ॥ বাবু—বাবু—

[নবেন্দু ঢোকে]

নবেন্দু ॥ একি ! কি হয়েছে ? প্রকাশ—প্রকাশ—

প্রকাশ ॥ মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গেল। প্রেসারটা বেড়েছে বোধ হয়। কিন্তু তুমি ঘুরে এলে যে ?

নবেন্দু ॥ বলছি। নকলু—তুমি ভেতরে যাও।

[নকলু চলে যায়]

শোন—যেতে যেতে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। তাই ঘুরে এলাম। আচ্ছা তোমাদের ফ্যাক্টরীতে একটা কেস-এর ব্যাপারে তোমার দাদা এ্যারেষ্ট হয়েছিলেন মনে আছে ?

প্রকাশ ॥ হ্যাঁ আছে। কিন্তু দাদা নির্দোষ ছিলেন।

নবেন্দু ॥ পুলিশ রিপোর্টে তাই আমি দেখেছি। তাই তোমার দাদাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পুলিশের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্য তোমার দাদার ফিঙ্গারপ্রিণ্ট রেখে দেওয়া হয়েছিল। তুমি এঁর ফিঙ্গারপ্রিণ্ট যোগাড় করতে পারবে ?

প্রকাশ ॥ ফিঙ্গারপ্রিণ্ট ! (চিন্তা করে) বোধহয় পারব। বোধহয় কেন—নিশ্চয়ই পারব।

নবেন্দু ॥ তাহলে শেষ চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। ফিঙ্গারপ্রিণ্ট কথনও দুজনের একরকম হয় না।

[প্রকাশের মনে আশার সঞ্চার হয়]

প্রকাশ ॥ সত্যি বলছো—সত্যি বলছো নবেন্দু ? ফিঙ্গারপ্রিণ্ট কথনো দুজনের একরকম হয় না !

নবেন্দু ॥ হ্যাঁ, ঠিক তাই।

প্রকাশ ॥ তাহলে নবেন্দু—এবার ঠিক প্রমাণ হয়ে যাবে যে, এই লোকটা আমার দাদা নয়।

নবেন্দু ॥ তাই যেন হয়! আমি যাই। (ঘুরে এসে) হ্যাঁ! আর একটা কথা, ফিঙ্গারপ্রিন্ট পেতে হলে কিছু সময় ওর খুসী মত তোমাকে চলতে হবে। পারবে তো?

প্রকাশ ॥ হ্যাঁ, পারবো?

নবেন্দু ॥ উইস ইওর গুড লাক্।

[নবেন্দু চলে যায়, বিকাশ ঢোকে]

বিকাশ ॥ হ্যাঁরে নিতু, তুই নাকি নকলুকে বকেছিস্। ছিঃ, চাকর বাকরকে কখনও এরকম বকতে হয়? তোর স্বভাবের অনেক পরিবর্তন হয়েছে দেখছি।

প্রকাশ ॥ (অনুগত সুরে) নকলু গিয়ে বুঝি আপনাকে লাগিয়েছে?

বিকাশ ॥ না না, সে বলে নি। আমিই ওকে জিজ্ঞাসা করলাম। যাক রাত অনেক হয়েছে—তুই খেয়েছিস্?

প্রকাশ ॥ আমি আজ আর খাব না।

বিকাশ ॥ কেন?

প্রকাশ ॥ খিদে নেই। আপনি খেয়ে নিন।

বিকাশ ॥ তোকে ছাড়া আমি কখনও খেয়েছি? এতদিন বাদে এলাম—তুই খাবি না—আমি কেমন করে খাই। যাকগে, চীকেন প্যাটীস্ খাবি?

প্রকাশ ॥ চীকেন প্যাটীস্!

বিকাশ ॥ হ্যাঁ, তোর মনে নেই? আমি প্রায়ই বানাতুম?

প্রকাশ॥ কিন্তু আপনি কেমন করে জানলেন?···ও···না····না আপনি তো জানবেনই। আপনি এনেছেন প্যাটীস্ ?

বিকাশ॥ হ্যাঁ। তোর জন্যে আমি বানিয়ে এনেছি। খাবি?

প্রকাশ॥ হ্যাঁ, খাব।

বিকাশ॥ খাবি? (উল্লসিত হয়ে) ওরে হরেন। শোন্ শোন্—

[হরেন ঢোকে]

হরেন॥ কি বলছেন বাবু?

বিকাশ॥ নিতু চীকেন প্যাটীস্ খাবে বলেছে। নিয়ে আয় প্যাটীস্। আর শোন্—

হরেন॥ বলুন—

বিকাশ॥ আমার জন্যেও আনিস। অনেকদিন বাদে আমরা দুভাই একসঙ্গে খাব।

হরেন॥ আচ্ছা বাবু। (হরেন ভেতরে যায়)

প্রকাশ॥ (স্বগতঃ) কি করে জানলো আমি চীকেন প্যাটীস্ খেতে ভালবাসি!······সব কিছু কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। অ্যাম আই ড্রিমিং·······অ্যাম আই······

বিকাশ॥ কি হলো? এই নিতু, কি সব বকছিস?

প্রকাশ॥ এ্যাঁ··না, না, ও কিছু নয়।

বিকাশ॥ আয়—বোস্।

[প্রকাশ চেয়ারে বসে। হরেন দুটো প্লেটে প্যাটীস্ এনে সাজিয়ে দিয়ে চলে যায়]

হরেনকে দিয়ে আর পারা যাচ্ছে না। (এগিয়ে গিয়ে) ওরে হরেন, দু'গ্লাস জল দিয়ে যা।

হরেন ॥ (নেপথ্যে) "যাই বাবু"

[এই ফাঁকে প্রকাশ প্লেট দুটো পাল্টে নেয়। হরেন প্লেটে করে দু'গ্লাস জল দিয়ে যায়। টেবিলে গ্লাস রাখবার সময় গ্লাসে যেন হাত না লাগে লক্ষ্য রাখতে হবে]

বিকাশ ॥ নে—খা। (দু'জনে খেতে থাকে) কেমন লাগছে ?

প্রকাশ ॥ ভাল।

[ভিতরে বাসন পড়ার শব্দ। বিকাশ জল খেয়ে ভিতরে যায়। প্রকাশ তাড়াতাড়ি পকেট থেকে রুমাল বের করে গ্লাসের ওপর ফেলে গ্লাসটিকে তুলে নেয় এবং ফোন করে]

হ্যালো ! সার্কুলার ! পুট মী টু বড়তলা পি, এস। এস্, আই নবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে একবার দিন তো। কে নবেন্দু ? আমি প্রকাশ। ফিঙ্গারপ্রিণ্ট আমি পেয়েছি। হ্যাঁ....হ্যাঁ...কাঁচের গ্লাসে। হ্যাঁ—আমি নিয়ে যাচ্ছি। এ্যাঁ—আমাকে যেতে বারণ করছো ? কাকে দিয়ে পাঠাই বলতো ?

["স্যার" বলে গোবিন্দ ঢোকে]

এই নবেন্দু হয়েছে ! এই মাত্র গোবিন্দবাবু এলেন, তাঁকে দিয়ে পাঠাচ্ছি। [ফোন রাখে]

গোবিন্দ ॥ কি ব্যাপার বলুন তো স্যার ? এখনও আপনি—

প্রকাশ ॥ গোবিন্দবাবু, খুব বিপদে পড়েছি। আপনাকে একটা উপকার করতে হবে।

গোবিন্দ ॥ আজ্ঞে—কি করতে হবে বলুন স্যার ?

প্রকাশ ॥ এটা এক্ষুণি বটতলা থানায় আমার বন্ধু নবেন্দুকে দিয়ে আসতে হবে।

গোবিন্দ ॥ এক্ষুণি ?

প্রকাশ ॥ হ্যাঁ—এক্ষুণি ! এই মুহূর্তে।

গোবিন্দ ॥ কি এটা ?

প্রকাশ ॥ একটা কাঁচের গ্লাস।

গোবিন্দ ॥ এই সামান্য কাজটুকু পারবো না ? কি যে বলেন স্যার এক্ষুণি যাচ্ছি। দিন (যেতে যেতে ফিরে) কি বল্লেন ? কাঁচে গ্লাস কেন বলুনতো ?

প্রকাশ ॥ পরে শুনবেন। এখন যান।

গোবিন্দ ॥ নিশ্চয়ই—যাব বৈকি। আপনার জন্যে—কি বলে—আমি প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারি।

প্রকাশ ॥ এই ভাবে ধরে নিন। দেখবেন গ্লাসের গায়ে হাত দেবেন না।

গোবিন্দ ॥ না না, গায়ে হাত লাগবে না। (যেতে গিয়ে আবার হঠাৎ ফিরে) কাঁচের গ্লাস কেন বলুন তো স্যার ?

প্রকাশ ॥ আঃ ! গোবিন্দবাবু যান—

[গোবিন্দকে ঠেলে বার করে দিয়ে একটা সিগারেট ধরায় বিকাশ ঢোকে]

বিকাশ ॥ জানিস নিতু—তোর চাকরটা একটু···ওঃ···খা, ইউ আর পারমিটেড টু স্মোক। আজকাল কি আর ওসব আছে ? বড় ভাইয়ের সামনে ছোট ভাই সিগারেট খেলে যদি বড় ভাইয়ের সম্মান ক্ষুণ্ণ হয় তবে সে সম্মান বাক্সে তুলে রাখা ভাল। (সোফায় বসতে গিয়ে খাবারের ডিসের প্রতি লক্ষ্য পড়বে) এই দেখ, খাবারের ডিস এখনও পড়ে আছে। হরেন—হরেন—

ন ॥ (ভিতর থেকে) যাই বাবু। (ঢুকে) ডাকছেন বাবু ?

াশ ॥ হ্যাঁ। ডিস দুটো এখনও পড়ে আছে কেন ?

ন ॥ নিয়ে যাচ্ছি বাবু। (ডিস দুটো হাতে করে একটা গ্লাস কম দেখে)....বাবু আর একটা গ্লাস ?

াশ ॥ এ্যাঁ। তাইতো। ওটাতো নিতুর গ্লাস। নিতু তো জল খায়নি। আমিই জল খেয়েছি। আমার গ্লাসটা কোথায় গেল ? নিতু জানিস ?

াশ ॥ ওয়ান্স ফর অল আই ওয়ার্ণ ইউ—নিতু বলে আমায় ডাকবেন না।

াশ ॥ নকুল—নকুল ! কি আশ্চর্য ! গ্লাসটা এরি মধ্যে কোথায় গেল ! হাওয়ায় উড়ে গেল নাকি ? (নকুল ঢোকে) তুই এখান থেকে একটা গ্লাস নিয়েছিস ?

ল ॥ আজ্ঞে, না তো !

কাশ ॥ (চিন্তা করে) গ্লাসটা তাহলে গেল কোথায় ? (হঠাৎ কি মনে হয়) হরেন—

রন ॥ বলেন বাবু—

কাশ ॥ আমাকে এখুনি একবার বাইরে যেতে হবে। তুই নকলু আর ছোটবাবুর উপর একটু নজর রাখিস। ছোটবাবুর মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। (চলে যেতে থাকে)

কাশ ॥ ঠিক তাই। (বিকাশ ঘুরে দাঁড়ায়) পাগলকে ভয় করে না আপনার ? পাগলের কামড় খেয়েছেন কোনদিন ? খুব বিষাক্ত —তাই না ? যাকে কামড়ায় সেও পাগল হয়ে যায়।

[বিকাশের দিকে এগিয়ে আসে]

বিকাশ ॥ সত্যি ! মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে !

[হরেন ভিতরে যায়। নকলু দরজা বন্ধ করতে যায়]

প্রকাশ ॥ পাগল ! আমাকে পাগল অপবাদ দিয়ে কাজ হাঁসি করতে চায়। তা আমি কিছুতেই হতে দেব না। কখ্খনে না। নাউ আই অ্যাম ফ্রী—এলোন—আই অ্যাম এলোন কিন্তু বড় ক্লান্ত। আই ওয়াণ্ট রেষ্ট ফর এ হোয়াইল—

প্রকাশ ॥ নকলু !

[প্রকাশ সোফায় গিয়ে বসে। নকলু দরজা বন্ধ করে দি ভেতরে যেতে থাকে]

নকলু ॥ বাবু—

প্রকাশ ॥ আমায় মদ এনে দে ।

নকলু ॥ আবার ওসব খাবেন বাবু ? ডাক্তার আপনাকে খা বারণ করেছে না ?

প্রকাশ ॥ এখন মদ না খেতে পেলে আমি যে পাগল হয়ে য নকলু—আমি যে পাগল হয়ে যাব···আমি যে আর····আ নকলু, লোকটাকে দেখে তোর কি মনে হলো ? লোকটা আমার সব সম্পত্তি গ্রাস করতে এসেছে !

নকলু ॥ সত্যি বাবু ! আপনার দাদা কিন্তু বেশ ভাল মানুষ।

প্রকাশ ॥ কি বললি ? কি বললি তুই ? আমার দাদা ? কে কে বলেছে ? কে বলেছে তোকে ?

নকলু ॥ আজ্ঞে উনি যে বল্লেন—

প্রকাশ ॥ না—না—ও আমার দাদা নয়। তুই কি বুঝতে পারছি

না নকলু, লোকটা একটা—তুই বা বুঝবি কেমন করে। যা, মদ নিয়ে আয়—

[নকলু ভেতর থেকে মদের বোতল ও গ্লাস এনে টেবিলে সাজিয়ে দিয়ে চলে যায়]

(মদ খেতে খেতে) কে। কে লোকটা! কি চায়! আমাকে শেষ করে কি আমার সম্পত্তি গ্রাস করতে চায়? না—কক্ষণো না—আমি তা হতে দেবো না। (মদ খায়) আমি কি সত্যি পাগল হয়ে যাবো! সত্যি—পাগল! (জোরে হেসে ওঠে)

[কিছু আগে হরেন চুপি চুপি প্রকাশের পিছনে এসে দাঁড়ায় এবং যা বলছে তা শোনবার চেষ্টা করে। হাসির সঙ্গে সঙ্গে ডাকে।]

হরেন ॥ বাবু!

প্রকাশ ॥ কে! ওঃ, তুমি! কি চাও? কি চাও তোমরা? কেন—কেন তোমরা এসেছ? উত্তর দাও—

[হরেন চলে যেতে থাকে]

শোন—(হরেনের কাছে এগিয়ে) কি চাই? কি চাই তোমার? টাকা? কত টাকা? বলো—কত টাকা তোমার দরকার?

হরেন ॥ সেকি ছোটবাবু! আমি টাকা দিয়ে কি করবো? আমি আপনার দাদার চাকর।

প্রকাশ ॥ আঃ—দাদা—দাদা—দাদা। ও আমার দাদা নয়। আমার দাদা মরে গেছে—হি ইজ ডেড্।

বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ শোনা যায়। হরেন দরজা

খুলে দেয়। বিকাশ ঢোকে। ঢুকেই মদের বোতল দেখতে পায়।]

বিকাশ ॥ মদ! মদ কে খাচ্ছিল, হরেন?

হরেন ॥ আজ্ঞে ছোটবাবু।

বিকাশ ॥ ছিঃ ছিঃ নিতু; শেষ পর্যন্ত তুই মদ ধরেছিস? বাবা সব চেয়ে যে জিনিষটাকে ঘৃণা করতেন—আর তুই কিনা—অপদার্থ। আরো অনেক কিছুর কথা আমি শুনলাম। এভাবে তুই টাকা ওড়াচ্ছিস? আমাদের সম্পত্তি তো দুদিনেই শেষ করে ফেলবি। ভেবেছিলুম আমি চলে যাব। এখন দেখছি আমাকে আরো কিছুদিন থাকতেই হবে! আমাদের সম্পত্তির অর্ধেক ভাগ আমাকে বুঝে নিতে হবে। দলিল আমার রেডী।

[জামার পকেট থেকে একটা দলিল বার করে]

প্রকাশ ॥ কি বললেন! অর্ধেক ভাগ বুঝে নিতে হবে?

বিকাশ ॥ নিশ্চয়ই! ছলে, বলে, দরকার হলে আইনের আশ্রয়ও আমাকে নিতে হবে। আমার অর্ধেক প্রপার্টি চাই।

প্রকাশ ॥ নো—আমি দেব না।

বিকাশ ॥ আলবাৎ দিবি।

প্রকাশ ॥ কখ্খনো না।

বিকাশ ॥ ইয়েস, তোকে দিতেই হবে।

প্রকাশ ॥ বটে! (পকেট থেকে রিভলবার বের করে) এই মুহূর্তে বেরুবেন কিনা বলুন।

বিকাশ ॥ ওটার মধ্যে কার্তুজ নেই। আমি বের করে নিয়েছি। আমার কাছেও একটা আছে। (পকেট থেকে রিভলবার

বার করে) তবে ভাইকে হত্যা করে "ভ্রাতৃহন্তা" হতে চাই না আমি।

[শুনে প্রকাশ মাথা ঘুরে বসে পড়ে। বিকাশ এসে ধরে]

কি হলো? কি হলো—নিতু?

প্রকাশ ॥ (নিজেকে সামলে নিয়ে) আমার কোন সম্পত্তি নেই—আপনি চলে যান—

বিকাশ ॥ নেই মানে? ব্যাঙ্কে আমাদের ছ'লাখ টাকা—তা ছাড়া দুটো ফ্যাক্টরী—

প্রকাশ ॥ আপনাকে আমি দেবো না—আপনি বেরিয়ে যান।

[নবেন্দু ঢুকেই প্রকাশের হাতটা চেপে ধরে রিভলবারটা কেড়ে নেয়]

নবেন্দু ॥ প্রকাশ—

প্রকাশ ॥ নবেন্দু! স্কাউণ্ড্রেলটা বলে কি না—

নবেন্দু ॥ (বাধা দিয়ে) স্কাউণ্ড্রেল উনি নন—স্কাউণ্ড্রেল তুমি। মুখোসটা খুলে গিয়ে তোমার আসল রূপটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

প্রকাশ ॥ নবেন্দু—

নবেন্দু ॥ নিজের দাদাকে যে অস্বীকার করে, তার মত অপদার্থ আর নেই।

প্রকাশ ॥ ও সব থাক নবেন্দু। ফিঙ্গারপ্রিণ্ট-এর কি হলো বলো?

নবেন্দু ॥ বিকাশ মুখোপাধ্যায়ের ফিঙ্গারপ্রিণ্ট-এর সঙ্গে ফিঙ্গারপ্রিণ্ট হুবহু মিলে গেছে।

প্রকাশ ॥ নো—মিথ্যে—মিথ্যে—সব মিথ্যে, তোমরা সবাই মিথ্যে কথা বলছো।

নবেন্দু ॥ আমি মিথ্যে বলছি? অপদার্থ, ইতর তুমি। তোমার মত একটা অভদ্রের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব থাকায় আমি লজ্জিত।

প্রকাশ ॥ প্লীজ, প্লীজ নবেন্দু এভাবে বোলো না। আমি সইতে পারছি না। সত্যি বলছি, আমি শেষ হয়ে যাব।

বিকাশ ॥ কেন শুধু শুধু নিজেকে তুই কষ্ট দিচ্ছিস নিতু? আমি ত বললাম, অর্ধেক সম্পত্তি আমায় দিয়ে দে। শুধু একটা সই করে দে তাহলেই হবে।

প্রকাশ ॥ না না—আমি দেবো না।

নবেন্দু ॥ নিশ্চয়ই তোমাকে দিতে হবে। তোমাদের সমস্ত সম্পত্তির অর্ধেক এঁরই প্রাপ্য। ইনি তোমার দাদা।

প্রকাশ ॥ নো, হি ইজ নট মাই ব্রাদার।

নবেন্দু ॥ আবার সেই কথা বলছো—ইনি তোমার দাদা নন?

প্রকাশ ॥ নো নো—হি ইজ এ চীট। নবেন্দু, তোমরা এভাবে আমায় মেরো না। আই ওয়াণ্ট টু লিভ; আমি বাঁচতে চাই—

নবেন্দু ॥ তাহলে স্বীকার করো ইনি তোমার দাদা। ফিঙ্গারপ্রিণ্ট যখন মিলে গেছে তখন আর কোন কথা থাকে না।

প্রকাশ ॥ থাকে, থাকে নবেন্দু তার পরেও কথা থাকে। বিশ্বাস কর ইনি আমার দাদা নন।

নবেন্দু ॥ ইয়েস, ইনিই তোমার দাদা।

প্রকাশ ॥ নো—নো—নো—হি ইজ নট।

বিকাশ ॥ হ্যাঁ—আমিই তোর দাদা। দলিলটায় সই কর।

াকাশ ॥ না—আপনি আমার দাদা নয়। কারণ আমি নিজের হাতে আমার দাদাকে খুন করেছি।

বেন্দু ॥ প্রকাশ—

[এই সময় হরেন ও নকলু ঢোকে। তাদের মুখে হাসি ফুটে ওঠে]

াকাশ ॥ (উল্লসিত) হিয়ার .দি কালপ্রিট কনফেসেস হিজ ক্রাইম।

[প্রকাশ হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে]

এক্সকিউজ মি নবেন্দুবাবু, আমি ইন্সপেক্টর হিমাংশু গাঙ্গুলি—সি, আই, ডি থেকে এসেছি। হিয়ার ইজ মাই আইডেন্টিটি কার্ড। কেসটা খুব জটিল ছিল। তাই অনেক রকম ভাবে তৈরী হতে হয়েছে। বিশেষ করে এঁর দাদার সঙ্গে আমার চেহারার অনেকটা মিল আছে বলে ডিপার্টমেন্ট আমার ওপরেই এই দায়িত্বটা দিয়েছে। (ফোন ডায়াল করে) হ্যালো—পুট মী টু পুলিশ হেড কোয়ার্টার। আমি ইন্সপেক্টর হিমাংশু গাঙ্গুলি কথা বলছি। কালপ্রিট কনফেসন দিয়েছে। ফিঙ্গারপ্রিণ্ট-এর ব্যাপারে আপনারা যে সহযোগিতা করেছেন তার জন্যে ধন্যবাদ। লোকাল সাব-ইন্সপেক্টর নবেন্দুবাবুকে ভার দিচ্ছি। ইনি প্রকাশবাবুকে এ্যারেষ্ট করে নিয়ে যাচ্ছেন। একটা ভ্যান পাঠিয়ে দিন। এঁ্যা—হাঁ্যা—হঁ্যা—ও. কে।

[ফোন রেখে ঘুরে নকলুকে দেখে]

এই যে পরেশবাবু—

কলু ॥ বলুন স্যার ?

বিকাশ॥ আপনার কাছ থেকে যে সমস্ত ইনফরমেশন পেয়েছি-সেগুলো অত্যন্ত কারেক্ট ছিল বলেই কালপ্রিট-কে এ তাড়াতাড়ি ধরতে পেরেছি। এজন্য আপনাকে অভিনন্দ জানাচ্ছি। দু'বছর চাকরের অভিনয় করা তো কম কথা নয় (হরেনের দিকে তাকিয়ে) আশীষবাবু! আপনাকেও অভিনন্দ জানাচ্ছি। নবেন্দুবাবু! আপনি প্রকাশবাবুকে নিয়ে থানা আসুন। ভ্যান এখুনি আসছে। পরেশবাবু এবং আশীষবা রইলেন আপনাকে হেল্‌প করার জন্য। আর আসবার সম আমার স্যুটকেশটাও নিয়ে আসবেন।

[হিমাংশু গাঙ্গুলি বেরিয়ে যান, নকলু ও হরেন পোষাক পাল্টাতে ভেতরে ঢোকে। মাথায় হাত দিয়ে প্রকাশ সোফা বসেছিল। নবেন্দু প্রকাশের কাছে এসে তার কাঁধে হা রাখতেই প্রকাশ মুখ তুলে নবেন্দুর দিকে তাকায়]

নবেন্দু॥ আই কাণ্ট হেল্‌প প্রকাশ, আই কাণ্ট হেল্‌প।

॥ পর্দা নেমে এল ॥

॥ অবশেষে ॥

প্রথম অভিনয় রজনী

পরিচালনা : বিমল রায়

চরিত্র		অভিনেতা
মৃত্যুঞ্জয় : কর্মঠ শ্রমিক যুবক	:	বিমল রায়
জীবন : ঐ বন্ধু, রুগ্ন	:	অজয় সরকার
সুখসিঞ্চন : ঐ প্রতিবেশী, সুখীলোক	:	অরুণ দাশগুপ্ত
অভয় : ইউনিয়নের নেতা	:	গিরিজা মুখোপাধ্যায়
বিশু : শ্রমিক যুবক	:	খগেন ঘোষ
অনিল : ঐ	:	সুধীর গুহ
রঘু : ঐ	:	কল্যাণ ঘোষ
অন্যান্য :	:	বিনয় গোস্বামী ও শশাঙ্ক

নেপথ্য সহযোগিতায় : তপন ঘোষ, অজিত সেনগুপ্ত, সুনির্মল বসু, তপন দাশগুপ্ত, সুনীল মুখার্জী, নিরঞ্জন ধর, সুবোধ মুখার্জী, ও সুশান্ত ঘোষ।

'অবশেষে' নাটকে যে সমস্ত জিনিষের দরকার :—

ষ্টেজে। একটি খাটিয়া বা চৌকি, একটি মোড়া, কিছু বইপত্র, একটি টেবিল, একটি বিছানা (গুটানো) , একটি কুঁজো ও একটি গ্লাস, একটি ক্যালেণ্ডার, একটি গামছা, কিছু আধ ময়লা জামা কাপড়, একটি ফ্যাক্টরীর তেল কালি মাখা ফুল প্যাণ্ট।

চরিত্র চিত্রণে :—

জীবন। একটি গায়ের চাদর, খাতা ও কলম, একটি রক্ত-মাখা ন্যাকরা।

মৃত্যুঞ্জয়॥ একটি কাঁচের গ্লাস, তাতে বালি, একটি মুড়ির ঠোঙা।

সুখসিঞ্চন॥ কিছু টাকা, একটি রুমাল, একটি থার্মোমিটার।

অভয়॥ একটি ফাইল, একটি রিষ্টওয়াচ ?

বিশু। একটি খামে ভরা চিঠি।

পোষাক পরিচ্ছদ চরিত্রানুযায়ী পরিচালকের নির্দেশেই হওয়া বাঞ্ছনীয়।

[কলিকাতার শহরতলীতে যে কোন বস্তির একটি ঘর। বস্তির ঘর সাধারণত যে রকম হয়, এঘরটি তা থেকে আলাদা রকমের কিছু নয়। একটি দড়ি টাঙানো, তাতে কিছু আধ ময়লা জামা কাপড় ঝুলছে, একটি ক্যালেণ্ডার দেখা যাচ্ছে। ঘরের মধ্যে বেমানান মনে হচ্ছে। এককোণে একটি টেবিলের উপর কিছু বইপত্র এবং রবীন্দ্রনাথের একখানা ছবি।

পর্দা উঠলে দেখা যাবে ঘরের একধারে একটি খাটিয়ায় জীবন বসে আছে। খুক খুক করে কাশছে সে। সমস্ত শরীর একটি চাদর দিয়ে আচ্ছাদিত। খাটিয়ার পাশে একটি মোড়ায় বসে আছে মৃত্যুঞ্জয়। টেবিলের নীচে একটি গুটানো বিছানা। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ।]

জীবন ॥ আজ কি সত্যই তুই কি ফ্যাক্টরীতে যাবি ?

মৃত্যুঞ্জয় ॥ হ্যাঁ।

জীবন। অন্যায় করা হবে না ?

মৃত্যুঞ্জয় ॥ হবে।

জীবন ॥ তবে।

মৃত্যুঞ্জয় ॥ তবুও যাবো।

জীবন ॥ আর কে কে যাবে ?

মৃত্যুঞ্জয় ॥ জানি না।

জীবন ॥ সবাই যদি রেগে যায় ?

মৃত্যুঞ্জয় ॥ রাগুক।

জীবন ॥ তবুও যাবি ?

মৃত্যুঞ্জয় ॥ হ্যাঁ। বাঁচতে হলে যেতে হবে। আর পারছি না।

জীবন ॥ কেমন করে পারবি ? খাটুনির একটা সীমা আছে।

মৃত্যুঞ্জয় ॥ (উঠে দাঁড়িয়ে) খাটুনিকে ভয় করি না। খেটেইতো বাঁচতে চাই।

জীবন ॥ পয়সা দিলে পরিশ্রম করা যায়। কিন্তু আজ তো একরকম বেগার খাটাবে তোদের।

মৃত্যুঞ্জয় ॥ শালার ম্যানেজারটা একটা শয়তান। দয়া মায়া কিছু নেই ওর মধ্যে।

জীবন ॥ কিন্তু এর কোন প্রতিকার হবে না ?

মৃত্যুঞ্জয় ॥ প্রতিকার। তোর মনে নেই নিমাইকে অসুখের মধ্যে ডেকে নিয়ে কাজ করিয়েছিল ; তাইতে অসুখটা ওর বেড়ে গেল ?

জীবন ॥ মনে থাকবে না কেন ? খুব মনে আছে সেদিনের কথা যেদিন নিমাই মারা গেল।

মৃত্যুঞ্জয় ॥ এখনও ওকে ভুলতে পারিনি। তুই আজ কেমন আছিস্ রে ?

[গায়ে হাত দেয়]

মৃত্যুঞ্জয় ॥ ইস্। গা যে তোর পুড়ে যাচ্ছে। একটা থার্মোমিটারও নেই যে তোর জ্বরটা দেখবো।

জীবন ॥ খুব বেশী হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না।

মৃত্যুঞ্জয় ॥ গা তোর পুড়ে যাচ্ছে আর তুই বলছিস খুব বেশী মনে হচ্ছে না !

জীবন ॥ (কথা ঘুরিয়ে) আর একটা কবিতা লিখছিলাম, শুনবি ?

মৃত্যুঞ্জয় ॥ (রেগে) রাখ তোর কবিতা। লিখছিস বলেই জ্বরটা তোর বেড়েছে। ডাক্তার বলেছে এ সমস্ত বন্ধ রাখতে। তা তুই শুনবি না! তাছাড়া কবিতাই যদি লিখবি তবে কুলি কারবারির কাজ করছিস কেন? আমাদের ওসব শোভা পায় না, বুঝলি?

জীবন ॥ সত্যই তুই রেগে গিয়েছিস, আর লিখবো না।

[মৃত্যুঞ্জয়ের কথায় জীবন ব্যথা পেয়েছে বুঝতে পেরে]

মৃত্যুঞ্জয় ॥ না না, লিখবি না কেন? নিশ্চয়ই লিখবি। তুই সত্যিই একজন ভাল কবি হতে পারতিস। অদৃষ্ট তোর খারাপ তাই আমাদের সঙ্গে একটা ফ্যাক্টরীতে কুলির কাজ করিস। তোর 'বিদায়' কবিতাটা তো মনোজবাবুর খুব ভাল লেগেছে।

জীবন ॥ মনোজবাবু?

মৃত্যুঞ্জয় ॥ বাঃ, মনোজবাবুকে ভুলে গেলি? তোর কবিতাটা তো সে-ই ছাপিয়ে দিল। টাকাওতো দেবে বলেছে।

জীবন ॥ এই কবিতাটা তোর খুব ভাল লেগেছে তাই না?

মৃত্যুঞ্জয় ॥ হ্যাঁ, তাইতো আমি সব সময় কবিতাটা আবৃত্তি করি। হ্যাঁ শোন, আমি একবার বাইরে যাচ্ছি জীবন। রান্না করার আজ কিছুই নেই। তাছাড়া তোর জন্য বার্লি আনতে হবে। তারপর ডাক্তারের কাছেও একবার যাবো ভাবছি।

জীবন ॥ কি দরকার?

মৃত্যুঞ্জয় ॥ দরকার আছে বলেই যাবো। শংকরবাবুর কাছেও একবার যেতে হবে—তোকে হাসপাতালে ভর্তি করার কতদূর কি করতে পারলেন জানতে।

জীবন ॥ হাসপাতালে আমি যাবো না।

মৃত্যুঞ্জয় ॥ তা যাবে কেন? গেলে যে বাঁচবার একটা পথ হয়।

[কথা বলতে বলতে মৃত্যুঞ্জয় জামা গায় দেয়। পকেটে হাত দিয়ে কয়েকটা নয়া পয়সা পায়। পয়সা হাতে করে একটা কিছু চিন্তা করতে থাকে।]

জীবন ॥ কি ভাবছিস?

মৃত্যুঞ্জয় ॥ এ্যাঁ। মাত্র চুয়াল্লিশ নয়া পয়সা আছে! তোর জন্য ওষুধ আনতে হবে, বার্লি আনতে হবে। তারপর তোর মাকেও টাকা পাঠাতে হবে। কিছু টাকা দরকার—বেশ কিছু টাকা—কার কাছে যে পাই!

জীবন ॥ আমি কেন বেঁচে আছি বলতে পারিস?

মৃত্যুঞ্জয় ॥ (জীবনের পাশে এসে বসে) তুই বেঁচে আছিস তোর জন্য, তোর মায়ের জন্য। তোর মা যে তোর মুখের দিকেই তাকিয়ে বসে আছে।

জীবন ॥ (মায়ের কথা মনে পড়ে যায়) অনেকদিন মা কোন চিঠিপত্র দিচ্ছে না। কেমন আছেন কে জানে!

মৃত্যুঞ্জয় ॥ কেমন থাকবেন আবার, ভালই····আছেন।

জীবন ॥ চার পাঁচ মাস কোন টাকাই পাঠাতে পারছি না। কত না যেন কষ্ট পাচ্ছে!

মৃত্যুঞ্জয় ॥ চিন্তা করছিস কেন? তোর মা কি আমার মা নয়? তোর না হয় অসুখ করেছে; কিন্তু আমিতো দাঁড়িয়ে আছি। লোহার মত শক্ত দুখানা হাত তো আমার এখনও আছে। তা দিয়েই একবার পৃথিবীটাকে আমি পাল্টে দেখতে চাই।

[মৃত্যুঞ্জয়ের মনে একটা আশঙ্কা মাঝে মাঝে উঁকি দেয়।]

মৃত্যুঞ্জয় ॥ কি জানিস, তোরও তো একদিন অসম্ভব শক্তি ছিল। ভারী ভারী জিনিস তুইতো একাই বইতে পারতিস। আমি হাঁ করে তাকিয়ে থাকতাম তোর অসম্ভব শক্তি দেখে। কিন্তু সেই তুই আজ কি হয়েছিস! জানিস, আমার বুকেও কেমন যেন একটা ব্যথা করে। মাঝে মাঝে মনে হয়, আমারও যদি তোর মতো অসুখ করে তাহলে—

[জীবন শঙ্কিত দৃষ্টিতে মৃত্যুঞ্জয়ের প্রতি তাকিয়ে থাকে। মৃত্যুঞ্জয় তা বুঝতে পেরে কথা ঘুরিয়ে বলে]

আরে দূর! সত্যি সত্যি বলছি নাকি? দেখলি তো, মিথ্যে মিথ্যে বানিয়ে কেমন একটা গল্প বলছিলাম তোকে?

[মৃত্যুঞ্জয় তাড়াতাড়ি কেটে পড়ে। জীবন উঠে গিয়ে কলম খাতা খাটিয়া থেকে টেবিলের উপর রাখে। সুখসিঞ্চন ঢোকে। পরনে তাঁর মূল্যবান জামা কাপড়]

সুখ ॥ কেমন আছেন জীবনবাবু?

জীবন ॥ বেশ ক দিন বাদে এলেন কিন্তু।

সুখ ॥ হ্যাঁ, আজ বিকেলে আমি বাড়ী যাচ্ছি, তাই এলাম দেখা করতে। একটা সুসংবাদ আছে।

জীবন ॥ কি বলুন তো?

সুখ ॥ আমার একটি ছেলে হয়েছে।

জীবন ॥ তাই নাকি, কবে হয়েছে?

সুখ ॥ দু'তিন দিন হলো।

[মোড়াটা টেনে খাটিয়ার পাশে সুখসিঞ্চন বসে, পকেট

থেকে রুমাল বের করে মোড়াটা ঝেড়ে নেয়, জামা কাপড় সামলে অতি সাবধানে বসে বলে]

জানেন, মা লিখেছে ষষ্ঠীর দিন বেশ কিছু লোকজন খাওয়াতে হবে।

জীবন ॥ আপনার স্ত্রী কোন্নগরে আছেন বুঝি?

সুখ ॥ হ্যাঁ। দু'তিন মাস আগেই বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। কারণ ওখানকার হাসপাতালে একজন ভাল লেডি ডাক্তার আছে

জীবন ॥ তাহলে ভালই করেছেন।

সুখ ॥ ছেলে হতেই প্রচুর টাকা খরচা হয়ে গেল। ডাক্তার নার্স এদের যা আজকাল ফী—তা দিয়ে একটা হাসপাতালই গড়া যায়।

জীবন ॥ আপনারা বড়লোক, খরচা করবেন বৈকি। ষষ্ঠীর দিনও বেশ টাকা খরচা হবে নিশ্চয়।

সুখ ॥ মা যখন বায়না ধরেছেন, তখন কিছু খরচা করতেই হবে। আর খরচা করবো নাইবা কেন? রোজগার করছিতো খরচ করার জন্যই।

জীবন ॥ বটেইতো।

সুখ ॥ তাছাড়া সুখ, আনন্দ এ সব যদি নাই করলাম, তাহলে জীবনের মুল্য কি। (এদিক ওদিক তাকিয়ে) আচ্ছা, মৃত্যুঞ্জয় বাবুকে তো দেখছি না। তিনি কোথায়?

জীবন ॥ বাইরে গেছে।

সুখ ॥ আমার মতের সঙ্গে কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়বাবুর মত মেলে না। উনি বলেন, সুখ আনন্দের ভিতর দিয়ে জীবনকে জানা যায় না।

আমি বলি, যদি সুখ-আনন্দই না করলাম, জীবনটাকেই যদি ভোগ না করলাম তাহলে বেঁচে থেকে লাভ কি !

বন ॥ মৃত্যুঞ্জয় একটু আলাদা ধরনের।

খ ॥ ঠিক বলেছেন। উনি যেন কাঠ-খোট্টা লোক। কোন রস নেই ওনার মধ্যে। উনি চান বাঁচতে অথচ জীবনটার দিকে নজর দেন না। আরে মশায়, জীবনটাকে মেরে কি কখনও বাঁচা যায়।

বন ॥ সুখসিঞ্চনবাবু, আপনার বাঁচার সঙ্গে আমাদের বাঁচার কিছু তফাৎ আছে।

খ ॥ তা অবশ্য আছে। তবে আমি অদৃষ্টবাদী আমি বুঝি ভগবান আমার দিন দিয়েছেন, তাই দু'দিন আনন্দ করে নিচ্ছি।

বন ॥ (প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে) ওসব কথা এখন থাক, তাহলে আপনি বলছেন, আপনার মা নাতি পেয়ে খুব খুসী হয়েছেন, কি বলেন ?

খ ॥ তা আর বলতে !

[মৃত্যুঞ্জয় ঢোকে, হাতে একটা কাগজের ঠোঙায় কিছু মুড়ি ও একটা কাঁচের গ্লাসে এক গ্লাস বার্লি]

ত্যুঞ্জয় ॥ কেমন আছেন সুখসিঞ্চনবাবু ?

খ ॥ আমি তো কখনও খারাপ থাকি না।

ত্যুঞ্জয় ॥ তা জানি। জানিস জীবন, বার্লি কিনে আমাদের পাশে রেষ্টুরেন্ট থেকে একেবারে তৈরি করে নিয়ে এলাম।

[টেবিলের ওপর বার্লির গ্লাস ও মুড়ির ঠোঙা রাখতে রাখতে কথা বলে।]

সুখ ॥ আচ্ছা, জীবনবাবুর অসুখটা সারছে না কেন বলুনতো ?

মৃত্যুঞ্জয় ॥ কেমন করে সারবে বলুন। যা করতে বলবো তার কিছু সে করবে না।

জীবন ॥ কোন্‌টে আমি করি না মৃত্যুঞ্জয় ?

মৃত্যুঞ্জয় ॥ কোনটাই করিস না।

সুখ ॥ না না, এটা আপনি বাড়িয়ে বলছেন। জীবনবাবু যদি কারুর কথা শোনে, সে হচ্ছেন আপনি !

মৃত্যুঞ্জয় ॥ আপনার ধারণা যে সত্যি নয় তার প্রমাণ আমি এক্ষুনি দিচ্ছি। (বার্লি ভর্ত্তি কাঁচের গ্লাসটা জীবনের মুখের কাছে ধরে।) বার্লিটা খা।

[জীবন ইতস্ততঃ করতে থাকে। মুখ ঘুরিয়ে নেয়।]

দেখলেনতো ? আপনার ধারণা যে ভুল তার প্রমাণ পেলেন ?

জীবন ॥ (অভিমানে) খাব না—আমি না করেছি নাকি ? দে (বার্লি কিছুটা খায়) আর খাব না।

মৃত্যুঞ্জয় ॥ সবটা খেতে হবে।

[রাগে ঢগ্ ঢগ্ করে একনিঃশ্বাসে বাকি সব বার্লিটুকু খেয়ে নেয় মৃত্যুঞ্জয় মুচকি হাসতে থাকে। সুখসিঞ্চন হো হো করে হেসে ওঠে।]

যাক, আপনি ছিলেন বলে সবটা খাওয়ান গেলো।

[পাশের কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে গ্লাসটা ধুয়ে টেবিলের ওপর রাখে।]

সুখ ॥ না না, খাবেন বৈকি জীবনবাবু। অসুস্থ হলে খাওয়াটা ঠিক রাখতে হবে। ঐতো সেবার আমার ফ্লু হলো, আমি তো

সারাদিন ফল খেয়েই থাকতাম। ফলটলগুলো খেলে দুর্বলতা অনেকটা কম লাগে।

মৃত্যুঞ্জয়॥ সুখসিঞ্চনবাবু, একটা থার্মোমিটারের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন? ওর জ্বরটা বুঝতে পারছি না।

সুখ॥ Hicks-এর থার্মোমিটাও কিন্তু ব্ল্যাক-এ একটু বেশী দাম ছাড়া পাবেন না।

মৃত্যুঞ্জয়॥ আমি কেনার কথা বলছি না। কোথাও থেকে দু'এক দিনের জন্য একটু ব্যবস্থা করে দিতে পারেন?

সুখ॥ ওঃ, আচ্ছা! আমার কাছেই একটা এক্সট্রা থার্মোমিটার আছে। দিয়ে যাবো এখন।

মৃত্যুঞ্জয়॥ যদি দেন তো খুব উপকার হবে।

সুখ॥ দেখুন, উপকার হবে কি জানি না। তারজন্য আমি মাথাও ঘামাই না। কাউকে সাহায্যই বলুন, উপকারই বলুন ওসবের আমি ধার ধারি না। তবে একটা থার্মোমিটার আমার কাছে পড়ে আছে তাই দিয়ে যাচ্ছি।

[সুখসিঞ্চন চলে যায়। মৃত্যুঞ্জয় টেবিলের ওপর থেকে মুড়ির ঠোঙাটা এনে জীবনের পাশে বসে।]

মৃত্যুঞ্জয়॥ নে, চাড্ডি মুড়ি খা। জ্বরে মুখে তেল দিয়ে মুড়ি ভালই লাগবে।

জীবন॥ না, আমি খাবো না।

মৃত্যুঞ্জয়॥ খাবি না—কেন?

জীবন॥ তোকে আমি বলেছি না যে আমার সঙ্গে তুই খাবি না।

মৃত্যুঞ্জয়॥ কেন, আমার জাত যাবে?

জীবন ॥ প্রাণ যাবে। আমার অসুখটা কি তোকেও বলতে হবে ?

মৃত্যুঞ্জয় ॥ প্রাণটা কি সুখের পায়রারে, যে একটু দুঃখের আঁচ পেলেই সে উড়ে পালাবে ! আর যদি শালা পালায়ই পালাক। নে-খা।

মৃত্যুঞ্জয় ॥ (খেতে খেতে) ডাক্তারের কাছে যাওয়া হয়নিরে, যাচ্ছিলাম — রাস্তায় মধুবাবুর সঙ্গে দেখা।

জীবন ॥ মধুবাবু ?

মৃত্যুঞ্জয় ॥ আমাদের বস্তির মালিক মধুবাবু, নাতির নাকি অসুখ। তাই তাঁর টাকার খুব দরকার। আমাদের তো তিন চার মাসের ঘর ভাড়া বাকি। তাই চাইলেন। বস্তির মালিক হলে কি হবে। লোকটা খুব ভদ্র। তাই মনটা আমার খুব খারাপ হয়ে গেল। ডাক্তারের কাছে আর গেলাম না। আর গেলেই বা কি হবে। ওষুধ আনবো সে পয়সাও তো নেই— কি যে করি !

[কথা বলতে বলতে খাটিয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। পরিবেশ গম্ভীর হয়ে আসে।]

জীবন ॥ তুই আর কি করবি। এখন করা হচ্ছে মরা।

[অভয় ঢোকে। ফ্যাক্টরীর ইউনিয়ন-এর একজন লীডার সে]

অভয় ॥ এই যে মৃত্যুঞ্জয়, শুনলাম তুমি নাকি আজ ফ্যাক্টরীতে যাবে ? (মৃত্যুঞ্জয় কোন উত্তর না দিয়ে ভেতরে চলে যেতে থাকে।) কি হে, উত্তর দিচ্ছ না যে ?

মৃত্যুঞ্জয় ॥ (গম্ভীরভাবে) কি উত্তর দেবো ?

অভয় ॥ সত্যি ফ্যাক্টরিতে যাবে তুমি ?

মৃত্যুঞ্জয় ॥ হ্যাঁ।

অভয় ॥ কেন ?

মৃত্যুঞ্জয় ॥ ইচ্ছা।

অভয়। (রেগে) মৃত্যুঞ্জয়। ইউনিয়নের নিষেধ তাহলে তুমি মানবে না ?

মৃত্যুঞ্জয় ॥ কেমন করে মানবো ?

অভয় ॥ যেমন করে অন্য পাঁচজন মানছে।

মৃত্যুঞ্জয় ॥ অন্য পাঁচজনের অবস্থা আর আমার অবস্থা এক নয় অভয়দা।

অভয় ॥ কিন্তু তুমি ভেবে দ্যাখো, ইউনিয়ন যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার বিরুদ্ধে গেলে তোমারও ভাল হবে না অন্য পাঁচ জনেরও ক্ষতি করবে তুমি। ফ্যাক্টরীর মালিক সপ্তাহে একদিন আমাদের দিয়ে আধা রোজে খাটিয়ে নিতে চায়। আজ যদি এর বিরুদ্ধে আমরা না দাঁড়াতে পারি তাহলে আমাদের অবস্থাটা কি হবে একবার ভেবে দেখেছ ?

মৃত্যুঞ্জয় ॥ না, আমি ভাববার দরকারও মনে করি না। মানুষকে আমি বিশ্বাস করি না। সবাই বেইমান। অসহায়ভাবে যখন সাহায্য চেয়েছি, কেউ সাহায্য করেনি। দূরে দাঁড়িয়ে হেসেছে সবাই। নিজে আগে বাঁচলে Union-এর কথা ভাববো অভয়দা!

অভয় ॥ না। Union-এর কথা মতো চলাই হচ্ছে আমাদের বাঁচার পথ।

মৃত্যুঞ্জয় ॥ মালিকের বিরুদ্ধে গেলে যদি আমার চাকরি যায়, তাহলে আমার অবস্থাটা কি হবে একবার ভেবে দেখেছো ?

অভয় ॥ সবার যে অবস্থা হবে তোমারও তাই হবে

মৃত্যুঞ্জয় ॥ তোমার সেই এক কথা। আমার অবস্থার সঙ্গে অন্য কারো তুলনা করো না অভয়দা।

অভয় ॥ কেন করবো না। তুমি কি অন্য পাঁচজন থেকে আলাদা ?

মৃত্যুঞ্জয় ॥ অনেকটা আলাদা, জীবনের আজ অসুখ, ওর চাকরিটা গেছে আজ তিন চার মাস, তা তুমি জানো ? সমস্ত ভার আমার বইতে হচ্ছে। জীবনের বিধবা মা দেশের বাড়ীতে মরতে বসেছে, জীবন ছাড়া তাঁর আর কেউ নেই। তাঁর ভারও আমার ওপর এসে পড়েছে। ঘর ভাড়া চার মাস দিতে পারছি না। বাড়ীওয়ালা আজ টাকা চেয়ে গেছে। পারবে—পারবে তোমার Union এ বিপদ থেকে আমাকে বাঁচাতে -

অভয় ॥ এ তর্কের মীমাংসা নেই। একটা জিনিস তুমি বুঝে ছাখো মৃত্যুঞ্জয়। মালিক চাইছে আমাদের মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করতে ; তুমি যদি আজ কাজে যাও তাহলে তারই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। সে বুঝে নেবে আমাদের মধ্যে একতা নেই। তুমি কি তাই চাও ? (একটু থেমে) আগে তো এরকম তুমি ছিলে না ! তুমি দুর্বল হয়ে গিয়েছ মৃত্যুঞ্জয়, দুঃখ দারিদ্র্যকে তুমি ভয় পাচ্ছ।

মৃত্যুঞ্জয় ॥ দুঃখ ! কতটুকু দুঃখ তুমি পেয়েছ অভয় দা ? দুঃখের কথা তুমি আমায় কি বলছ ? পারবে, পারবে তুমি আমার দুঃখের কথা শুনে তোমার চোখে জল ধরে রাখতে ? জানি পারবে না। সবটুকু জলই মজুত রেখে দাও, কাজে লাগবে। (বলে ভিতরে

চলে যেতে গিয়ে আবার ফিরে) অভয়দা, এইটুকু বয়স থেকে আমি পৃথিবীতে একলা। স্নেহ ভালবাসা আমি কারো কাছে কোন দিন পাইনি—কাকে বলে তাও জানি না। একটু স্বাদ পেয়েছি জীবনের মায়ের কাছ থেকে। তাও বুঝি হারাচ্ছি—জীবনের মা দেশের বাড়ীতে না খেতে পেয়ে মরতে বসেছে।

[জল ভরা চোখে মৃত্যুঞ্জয় ভেতরে চলে যায়, পরিবেশ গম্ভীর হয়ে ওঠে। অভয় ধীরে মোড়ায় এসে বসে। সহানুভূতির সুরে বলে]

ভয় ॥ দেশের বাড়ীতে তোমার মা একা আছেন বুঝি ?

ীবন ॥ (মাথা নেড়ে) হ্যাঁ। আমার মাকে মৃত্যুঞ্জয় নিজের মায়ের মত ভালবাসে। ওর মা-বাবা আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। ছোট বেলাতেই ওর মা-বাবা মারা গেছে। জীবনটা ওর খুব দুঃখের।

অভয় ॥ দুঃখের জীবন আমাদের সবারই ভাই, তা নাহলে আমরা সব সামান্য মাইনেতে একটা ফ্যাক্টরিতে চাকরি করতে আসবো কেন ?

জীবন ॥ নিজের মনের কথা মৃত্যুঞ্জয় এমন ভাবে ঢেকে রাখে যে অন্য কেউ জানতেও পারে না মৃত্যুঞ্জয় ভেতরে ভেতরে কাঁদছে।

অভয় ॥ হ্যাঁ, খুব চাপা ছেলে।

জীবন ॥ অভয়দা, আমি ভাল হয়ে গেলে আবার চাকরিটা পাবো তো !

অভয় ॥ পাবে কিনা জানি না। তবে Union তোমার হয়ে চেষ্টা নিশ্চয়ই করবে। তার জন্যইতো চাই একতা। তুমি মৃত্যুঞ্জয়কে বুঝিয়ে বলো, সে যেন আজ কাজে না যায়।

জীবন ॥ আমি অনেকবার বলেছি অভয়দা। আর কোন্ মুখেই ব
বলি বলুন ? ওর যা অবস্থা, অন্য কেউ হলে পাগল হয়ে যেতো
অভয় ॥ বুঝিরে ভাই— আমি সবই বুঝি। আমি তো আর রাজ
বাদশার ঘর থেকে আসিনি ! আমি তোমাদের মতই একজন
যাক সে কথা, তোমাকে বলা রইল, তুমি মৃত্যুঞ্জয়কে আটকাবে
ও যদি আজ কাজে যায় তা হলে ওর মত একশোজন বন্ধুদে
তো সে মারবেই, নিজেও সে মৃত্যুর পথ তৈরি করবে।

জীবন ॥ আমি চেষ্টা করবো।

অভয় ॥ হ্যাঁ, চেষ্টা করো। আমি যাই, দুটো থেকে কিন্তু ফ্যাক্টরী
চালু হবার কথা, পরে আমি একবার আসবো।

[অভয় চলে যায়, মৃত্যুঞ্জয় ভেতর দিক থেকে বাইরে যেতে থাকে

জীবন ॥ আবার কোথায় চললি ?

মৃত্যুঞ্জয় ॥ বাইরে।

জীবন ॥ এখন আবার কেন ?

মৃত্যুঞ্জয় ॥ দেখি কারো কাছ থেকে কিছু টাকা ধার পাই কিনা
মধুবাবুর নাতির অসুখ ; দরকারের সময় তাঁর পাওনা টাকা
তাঁকে দিতে পারলাম না। তারপর তোর ওষুধ আনতে হবে
কিছু টাকা আজ পেতেই হবে।

জীবন ॥ আজ তুই রান্না বান্না করবি না ?

মৃত্যুঞ্জয় ॥ না। বাইরে থেকে ভাত খেয়ে নেবো।

জীবন ॥ বাইরে তোর আর খাওয়া হবে না, তা আমি জানি।
জানি না। আর কত দিন এ কষ্ট সইতে পারবি।

মৃত্যুঞ্জয় ॥ সইতেই হবে, বেঁচে আমরা থাকবোই। ভয় পাচ্ছিস কেন,

ভাল হয়ে নিশ্চয়ই উঠবি। মনিবাবু বলেছেন Draftsmanship-টা পাস করতে পারলে একটা ভালো চাকরি পাইয়ে দেবে। ভালো হয়ে উঠে Draftmanship টা পাস করে নিবি, তখন আর আমাদের এত কষ্ট থাকবে না। তখন আমরা মানুষের মত বাঁচতে পারবো।

[সুখসিঞ্চন ঢোকে]

সুখ ॥ এই নিন থার্মোমিটার।

মৃত্যুঞ্জয় ॥ দিন। (মৃত্যুঞ্জয় হাত পেতে নেয়। থার্মোমিটার ঝাঁকতে ঝাঁকতে বলে) একটা থার্মোমিটার না থাকায় ওর জ্বরটা বুঝতে পারছি না।

সুখ ॥ জীবনবাবু যতদিন ভাল না হোন থার্মোমিটারটা এখানেই থাক।

মৃত্যুঞ্জয় ॥ (জীবনের মুখে থার্মোমিটার লাগাতে লাগাতে) না ভাই, আপনি নিয়ে যান। ভেঙ্গে গেলে আবার মুস্কিলে পড়বো। হ্যাঁ ভাল কথা, আপনি যেন চলে যাবেন না সুখসিঞ্চন বাবু। একটা দরকারী কথা আছে।

সুখ ॥ আচ্ছা। (মৃত্যুঞ্জয় ভেতরে চলে যায়, সুখসিঞ্চন এসে মোড়ায় বসে) আপনাকে কিন্তু একটা কথা বলা হয়নি মৃত্যুঞ্জয়বাবু।

[মৃত্যুঞ্জয় ভেতর থেকেই উত্তর দেয়]

মৃত্যুঞ্জয় ॥ কি কথা বলুন তো ?

সুখ ॥ আমার একটা ছেলে হয়েছে।

মৃত্যুঞ্জয় ॥ তাই নাকি ?

সুখ ॥ হ্যাঁ। পরশু দিন ষষ্ঠি। খুব ধূমধাম হবে। আপনার

নেমন্তন্ন রইল। জীবনবাবুতো যেতে পারবেন না, তাই আপনাকে কিন্তু যেতে হবে।

ত্যুঞ্জয়॥ চেষ্টা করবো।

সুখ॥ চেষ্টা নয়। যেতেই হবে। কোন্নগর তো খুব বেশী দূর না।

[মৃত্যুঞ্জয় ঢোকে]

মৃত্যুঞ্জয়॥ আপনাকে দেখলে সত্যিই আমার হিংসে হয় সুখসিন্ধু বাবু।

সুখ॥ হিংসে, কেন?

মৃত্যুঞ্জয়॥ কত সুন্দর জীবন আপনার।

[জীবনের মুখ থেকে থার্মোমিটার নিয়ে দেখে]

সুখ॥ দেখুন, মাত্রতো কটা বছরের জন্য পৃথিবীতে এসেছি। জীবনটাকে ভোগ করে নিতে চাই। যত রকম সুখ আছে তা ভোগ করে তবে মরবো।

মৃত্যুঞ্জয়॥ ইস্, ১০২ জ্বর!

[জীবন ভেতরে যাবার জন্য খাটিয়া থেকে উঠে দাঁড়ায়]

সুখ। এত জ্বর! উঠছেন কেন? শুয়ে পড়ুন।

মৃত্যুঞ্জয়॥ কোথায় যাচ্ছিস?

জীবন॥ ভিতরে।

[জীবন কাশতে কাশতে ভেতরে চলে যায়। মৃত্যুঞ্জয় জল দিয়ে থার্মোমিটারটা ধুতে থাকে]

সুখ॥ জীবনবাবু কেমন সুন্দর ছিল। কিন্তু কী চেহারাই হয়েছে।

মৃত্যুঞ্জয়॥ প্রাণেই যদি না বাঁচলো, চেহারা দিয়ে কি হবে। জীবনের মায়ের কত আশা, জীবন বড় হবে, বিয়ে দিয়েবউ ঘরে আনবে।

কিন্তু দেখুন, কি আশা ছিল, আর কি হতে বসেছে। (থার্মোমিটারটা ধুয়ে মুছে খাপে ভরে ফেরত দেয়) নিন থার্মোমিটারটা।

সুখ ॥ সত্যি, খুবই দুঃখের। দুঃখ কষ্টটা মানুষের একটা অভিশাপ। আচ্ছা আমি এখন যাই। আমাকে আবার মার্কেট যেতে হবে। প্রচুর টাকার জিনিসপত্র কেনা কাটা করবো।

মৃত্যুঞ্জয় ॥ কেন?

সুখ ॥ বাঃ, ছেলের ষষ্ঠির জিনিসপত্র তো এখান থেকেই কিনে নিয়ে যাচ্ছি। জানেন, ছেলেটার জন্য একজোড়া সোনার বালা কিনে নিয়ে যাবো ভাবছি। ছেলেটা খুব Lucky হয়েছে আমার।

[মৃত্যুঞ্জয় খাটিয়ায় বসে, সুখসিঞ্চন মোড়ায় বসলেন]

মৃত্যুঞ্জয় ॥ তাই নাকি?

সুখ ॥ যেদিন হয়েছে ছেলেটা সেদিন আমি একটা মোটা টাকা পেয়েছি। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে হোটেলে গিয়ে বেশ আনন্দ করলাম। আচ্ছা, ছেলের জন্য বালা নেবো না হার নেবো বলুনতো!

মৃত্যুঞ্জয় ॥ আপনার যেটা ভাল লাগে তাই নেবেন।

সুখ ॥ আরে আমারতো ইচ্ছে বালা এবং হার দুটোই নিয়ে যাই।

মৃত্যুঞ্জয় ॥ তবে তাই নিন।

সুখ ॥ এঁ্যা—

মৃত্যুঞ্জয়। হ্যাঁ দুটোই নিন।

সুখ ॥ ঠিক বুদ্ধি দিয়েছেন। দুটোই নিয়ে যাই। বৌ খুব খুসী হবে। বিয়েতো করলেন না, বৌকে খুসী করার মধ্যে যে কত আনন্দ তার স্বাদও পেলেন না। জীবনই বৃথা আপনাদের!

মৃত্যুঞ্জয় ॥ সত্যি বৃথা। কিছুই করতে পারলাম না আমরা। আমি না হয় লেখাপড়া কিছু শিখিনি। কিন্তু জীবনতো ম্যাট্রিক পাস করেছে। ওতো বড় হতে পারতো।

সুখ ॥ বড় কি বলছেন জীবনবাবু একজন ভাল কবি হতে পারতেন। উনি আমার বিয়ের সময় কবিতা লিখে দিয়েছিলেন। তা এমন ভাল হয়েছিল, যে সবাই জানতে চেয়েছিল কবিতাটা কে লিখেছে। জীবনবাবু যে একটা ফ্যাক্টরীতে মজুরের কাজ করেন সে কথা অবশ্য আমি চেপে গিয়েছি।

মৃত্যুঞ্জয় ॥ চেপে গেলেন কেন ?

সুখ ॥ আমার একটা প্রেস্টিজ আছে না ?

মৃত্যুঞ্জয় ॥ ওঃ !

সুখ ॥ তাছাড়া কেউ বিশ্বাসই করতো না যে—এত ভাল কবিতা যে লেখে সে কিনা একটা ফ্যাক্টরীতে মজুরের কাজ করে। ইস্, এই দেখো কথা বলতে বলতে কত দেরি হয়ে গেল। আবার আমাকে জিনিসপত্র কিনে বাড়ী যেতেই হবে। মা পথ চেয়ে হয়তো বসে আছে কখন আমি বাড়ী যাবো।

মৃত্যুঞ্জয় ॥ আমার আসল কথাটা কিন্তু এখনও বলা হয়নি।

[জীবন ঢোকে। খাটিয়ায় বসে।]

সুখ ॥ বলুন, তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন।

মৃত্যুঞ্জয় ॥ আমায় কিছু টাকা ধার দিতে পারেন ? পরের মাসেই দিয়ে দেবো।

সুখ ॥ ব্যস্ হয়ে গেল ! এক হাঁড়ি দুধের মধ্যে এক ফোঁটা চোনা পড়ে গেল।

ত্যুঞ্জয় ॥ বিশ্বাস করুন, ভীষণ দরকার টাকার। ভয়ানক বিপদ আমাদের।

সুখ ॥ দুনিয়ার সবাই টাকা ধার চায়। আমি ভেবেছিলাম আপনারা বুঝি তা থেকে কিছু আলাদা। তাই আপনাদের সঙ্গে আমার এত বন্ধুত্ব ছিল। সেটা নষ্ট করে দিলেন?

ত্যুঞ্জয় ॥ বিশ্বাস করুন, দরকার না হলে চাইতুম না।

সুখ ॥ টাকার দরকার সবারই থাকে মশাই। আমি কারো কাছে টাকা ধার চাই না। কেউ আমার কাছে ধার চায় তাও আমি চাই না। দেখুন, টাকা আমার আছে ঠিকই এবং প্রয়োজনের বেশী খরচাও করে থাকি। কিন্তু এ সমস্ত দেনা-পাওনা আমি পছন্দ করিনা। মাপ করবেন।

[সুখসিঞ্চন চলে যায়। লজ্জা এবং ঘৃণায় কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মৃত্যুঞ্জয়। জীবন তা লক্ষ্য করে সহানুভূতির সুরে বলে]

জীবন ॥ ওকে তো জানিস, কেন ওর কাছে টাকা চাইতে গেলি?

মৃত্যুঞ্জয় ॥ (রীতিমত চিৎকার করে) তুই চুপ করতো! কেন টাকা চাইতে হয় তুই তার কি বুঝবি? তোর তো গায়ে আঁচড়টি লাগছে না! কি দিয়ে কি হচ্ছে তা আমি টের পাচ্ছি—তাই আমাকে টাকা চাইতে হচ্ছে।

[এ অবস্থার জন্য কেউই প্রস্তুত ছিল না। ভুল হয়ে গেছে বুঝে মৃত্যুঞ্জয় সরে গিয়ে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে। জীবনের দু'চোখ জলে ভরে আসে। জীবনের প্রতি এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে মৃত্যুঞ্জয় অনুতপ্ত হয়ে পড়ে। ধীরে

ধীরে জীবনের কাছে এগিয়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে মৃত্যুঞ্জয় কেঁদে ওঠে]

আমি তোকে একথা বলতে চাইনিরে ! বিশ্বাস কর, আমি তোকে একথা বলতে চাইনি। (একটু সামলে নিয়ে) জানিস, মাঝে মাঝে তোর কথাই ঠিক বলে মনে হয় ; হয়তো তুই, তোর মা. আমি কেউ বাঁচবে' না রে—আমরা কেউ বাঁচবো না।

[বিশু ঢোকে হাতে একখানা খাম]

বিশু ॥ এই যে মৃত্যুঞ্জয়দা, মনোজবাবু একখানা চিঠি দিয়েছে।

[চোখের জল লুকিয়ে মৃত্যুঞ্জয় চিঠিখানা নিয়ে উপরের নামটি পড়ে]

মৃত্যুঞ্জয় ॥ কবি জীবনকৃষ্ণ,—তোর চিঠি।

জীবন ॥ পড়।

[খামটা ছিঁড়ে ফেলে চিঠিটা পড়ে। পড়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলে মৃত্যুঞ্জয়]।

মৃত্যুঞ্জয় ॥ জীবন, তোর কবিতার জন্য তুই দশ টাকা পেয়েছিল মনোজবাবু ইত্তিকথার অফিস থেকে টাকাটা নিয়ে আসতে বলেছে (হাত দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে) পাগলা কবি হয়েছে —কবি জীবন কৃষ্ণ দত্ত। বিশু—তুই একটা কাজ করতে পারিস—তুই গিয়ে……না না থাক, আমিই যাবো। আমাকেই যেতে হবে।

বিশু ॥ কি হয়েছে মৃত্যুঞ্জয়দা ? আমিতো কিছুই বুঝতে পারছিনা

মৃত্যুঞ্জয় ॥ বুঝতে পারছিস্ না, জীবন কবি হয়েছে। কবিতা

লিখে টাকা পেয়েছে। আমার কি যে আনন্দ হচ্ছে বিশু—আমার ইচ্ছে হচ্ছে—

বিশু॥ কি?

মৃত্যুঞ্জয়॥ আমার ইচ্ছে আমি চিৎকার করে খানিকটা হাসি, চিৎকার করে খানিকটা (থেমে) কিছুই করতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

বিশু॥ এ্যাঁ—।

মৃত্যুঞ্জয়॥ হ্যাঁ, শুধু ইচ্ছে হচ্ছে ওকে ধরে ঠেঙ্গাই। কেন ও আমাদের সঙ্গে জড়িয়ে ওর জীবনটা নষ্ট করে দিল। ওকে কেউ চিনলো নারে বিশু। একটা কাজ কর বিশু, মনোজবাবুকে গিয়ে বল্ আমি আজই গিয়ে টাকাটা নিয়ে আসবো।

বিশু॥ এখনই যেতে হবে?

মৃত্যুঞ্জয়॥ কেন, এখন তোর কোন কাজ আছে নাকি?

বিশু॥ না। কোন কাজ নেই। আজতো আমরা ফ্যাক্টরীতে কেউ যাচ্ছি না।

[মৃত্যুঞ্জয়ের হঠাৎ ফ্যাক্টরীতে যাবার কথা মনে পড়ে যায়]।

মৃত্যুঞ্জয়॥ এখন ক'টা বাজেরে বিশু?

বিশু॥ এখন প্রায় দুটো বাজে।

মৃত্যুঞ্জয়॥ এ্যাঁ। আচ্ছা তুই যা বিশু আবার পরে দেখা হবে।

[বিশু চলে যায়। মৃত্যুঞ্জয় দড়িতে ঝোলানো ফ্যাক্টরীতে পরে যাবার তেল কালি মাখা খাকি প্যান্টটা হাতে নেয়]

মৃত্যুঞ্জয়॥ আমি ফ্যাক্টরীতে চললাম জীবন। ফেরবার সময়

মনোজবাবুর কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে তোর ওষুধ কিনে নিয়ে আসবো।

জীবন ॥ আমার একটা কথা শোন মৃত্যুঞ্জয় ? ফ্যাক্টরীতে গিয়ে তোর কাজ নেই।

মৃত্যুঞ্জয় ॥ জীবন, আমি বুঝতে পারছি—আমি বেইমানী করতে যাচ্ছি। কিন্তু বাঁচতে হলে যেতেই হবে।

জীবন ॥ কি দরকার এভাবে বাঁচবার।

মৃত্যুঞ্জয় ॥ (বিদ্রোহীকণ্ঠে) মানুষের মত তো বাঁচবার চেষ্টা করলাম—কিন্তু বাঁচতে পারছি কৈ ? দুনিয়াটাই আজ বেইমানীতে চলছে। তাই বেইমান না হলে এ দুনিয়ায় বেঁচে থাকা যাবে না।

জীবন ॥ এ ছাড়া কি বাঁচবার অন্য কোন উপায় নেই ?

মৃত্যুঞ্জয় ॥ আমাদের সামনে যে ভীষণ বিপদ জীবন। ভেবে দেখ. তোর চাকরিটা গেছে। আজ মালিকের বিপক্ষে গিয়ে যদি আমার চাকরিটাও যায়, তাহলে কেমন করে তুই ভাল হবি, কেমন করে তোর মা বাঁচবে, কেমন করে আমরা বাঁচবো। কেউ না, কেউ বাঁচবো নারে—কেউ বাঁচবো না, তুই আমাকে যেতে বারণ করিসনা জীবন। এটাই আমাদের বেঁচে থাকবার পথ।

জীবন ॥ কিন্তু লোকে যদি ঘৃণা করে ?

মৃত্যুঞ্জয় ॥ লোকে যদি ঘৃণা করে আমার মুখ না দেখে কিছু এসে যাবে না তাতে যদি তোকে ভাল করে তুলতে পারি, ভাল হয়ে উঠে তুই যদি চাকরী করতে পারিস—যদি তোর মায়ের দুঃখ

ঘোচাতে পারিস সেটাই আমাদের বড় লাভ হবে। তাই আমি যাবো। শুধু একটা কথা, তুই আমাকে ঘৃণা করিস না।

[কথা বলতে গিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের চোখে আবার জল আসে]

জীবন ॥ যা তুই। আমি আর বারণ করবো না।

মৃত্যুঞ্জয় ॥ (জল ভরা চোখে হেসে) এইতো বন্ধুর মত কথা। দেরি হয়ে গেল বোধ হয়। আমি চললাম।

[প্যান্টটা হাতে করেই চলে যেতে থাকে মৃত্যুঞ্জয়। হঠাৎ মাথা ঘুরে যায়। মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। জীবন তা লক্ষ্য করে]

জীবন ॥ কি হলো?

মৃত্যুঞ্জয় ॥ কিছু না।

[মৃত্যুঞ্জয় চলে যায়। একটু বাদে সুখসিঞ্চন ঢোকে। জীবন তাঁর দিকে তাকিয়েই মুখ নামিয়ে নেয়। সুখসিঞ্চনের কণ্ঠে অনুশোচনার সুর]

সুখ ॥ মৃত্যুঞ্জয় কোথায়?

জীবন ॥ বাইরে গেছে।

সুখ ॥ কোথায় বলতে পারেন?

জীবন ॥ (মাথা নেড়ে) না!

সুখ ॥ দেখুন, সে সময় মৃত্যুঞ্জয়বাবুকে কতকগুলো বিশ্রী কথা বলে ফেলেছি। এখন বুঝতে পারছি ওভাবে বলাটা আমার অন্যায় হয়ে গেছে। এই টাকা ক'টা আপনি রেখে দিন।

জীবন ॥ না না, টাকার আমাদের আর দরকার নেই।

সুখ ॥ জীবনবাবু, ভুল কি কারো হয় না!

জীবন ॥ কেন হবে না !

সুখ ॥ তাহলে আমার ভুলটিকে শোধরাতে দিচ্ছেন না কেন ?

জীবন ॥ সুখসিঞ্চনবাবু, বড় কষ্টের জীবন আমাদের। বড় বিপদে পড়ে মৃত্যুঞ্জয় আপনার কাছে টাকা চেয়েছিল। কিন্তু আপনি ওর মুখ রাখলেন না।

সুখ ॥ জীবনবাবু, মানুষ হঠাৎ উপরে উঠে গেলে আবার পড়ে যাবার তাদের ভয় থাকে। তাই নীচের দিকে তাকাতে তারা ভয় পায়। আমারও বোধ হয় তাই। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমারও একটা মন আছে এবং সেটা মানুষেরই। এই ভুলটা আমাকে শোধরাতে দিন জীবনবাবু

[বিশু ডাকতে ডাকতে দৌড়ে ঢোকে]

বিশু ॥ মৃত্যুঞ্জয়দা-মৃত্যুঞ্জয়দা ! জীবনদা, মৃত্যুঞ্জয়দা কোথায় ?

জীবন ॥ কেনরে বিশু, কি হয়েছে ?

বিশু ॥ অনিল, রঘু ওরা সব মৃত্যুঞ্জয়দাকে মারবে ঠিক করেছে

জীবন ॥ সে কি ? কেন ? (জীবন উঠে দাঁড়ায়)

বিশু ॥ মৃত্যুঞ্জয়দা নাকি আজ ফ্যাক্টরীতে যাবে—তাই।

জীবন ॥ এঁ্যা !

বিশু ॥ মৃত্যুঞ্জয়দা কোথায় ?

জীবন ॥ বিশুরে, সর্বনাশ হয়ে গেল বোধ হয়।

সুখ ॥ মৃত্যুঞ্জয় ফ্যাক্টরীতে গেছে।

সুখসিঞ্চন } এঁ্যা :—
বিশু }

জীবন ॥ এখন কি হবে ? (কাশি)

বিশু ॥ অভয় দা—

অভয় ॥ ভয় নেই ভাই।

বিশু ॥ আমিও ফ্যাক্টরীতে যাচ্ছি।

অভয় ॥ তুমি জীবনের কাছে থাক।

[অভয় আবার ছুটে যেতে থাকে। এমন সময় কাশতে কাশতে জীবনের মুখ দিয়ে খানিকটা রক্ত বেরোয় ভয় পেয়ে বিশু চিৎকার করে ওঠে।]

বিশু ॥ র—ক্ত!

অভয় ॥ রক্ত!

[অভয় আবার জীবনের কাছে ছুটে আসে—জীবন কাশতে থাকে]

বিশু ॥ কি হলো—কি হলো জীবনদা—

অভয় ॥ জীবন—জীবন—

[দূর থেকে সুখসিঞ্চনের গলা শোনা যায়, জীবনবাবু—জীবনবাবু]

অভয় ॥ কার গলা শোনা যাচ্ছে ?

বিশু ॥ কে যেন ডাকছে!

[দৌড়ে সুখসিঞ্চন ঢোকে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলে]

সুখ ॥ জীবনবাবু, সর্বনাশ হয়ে গেছে।

অভয় ॥ কি হয়েছে ?

[মঞ্চ একেবারে নিস্তব্ধ। জীবন উঠে দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকে]

সুখ ॥ তিন নম্বর ট্রান্সমিটারটা নাকি খারাপ ছিল। মৃত্যুঞ্জয়বাবু মাথা ঘুরে মেসিনের উপর পড়ে গেছে। আর মেসিন তাঁকে টেনে নিয়েছে।

অভয় ॥ তারপর ?

সুখ ॥ মৃত্যুঞ্জয়বাবু—

অভয় ॥ কেমন আছে !

সুখ ॥ মারা গেছে !

অভয় ॥
বিশু ॥ } এঁ্যা—

[অভয় ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগিয়ে আসে। ব্যথিত কণ্ঠে বলে]

অভয় ॥ ভগবান ওকে রক্ষা করেছেন। কলঙ্কের মুখ ওকে আর দেখাতে হলো না। মৃত্যুঞ্জয় মরে বেঁচেছে।

[জীবন শূন্য দৃষ্টিতে হাবার মত তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পৃথিবীর গতি যেন ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেছে তার কাছে। কি যেন সে বলতে চাইছে ; কিন্তু বলতে পারছে না। বোবার মত ঠোঁট দুটি তাঁর কাঁপতে থাকে। 'মৃত্যুঞ্জয় মরে বেঁচেছে'—একথার সঙ্গে সঙ্গে তার চেতনা ফিরে আসে ! অন্তর বিদারী চিৎকারে সে ভেঙ্গে পড়ে]

জীবন ॥ না—মৃত্যুঞ্জয় মরেনি—মরতে পারে না।

—যবনিকা—

['পরিচালনার ক্ষেত্রে এখানে একটি কথা বলে দেওয়া দরকার। নাটকের শেষের দিকে বিশু ঢোক'র পর থেকে মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু সংবাদ নিয়ে সুখসিঞ্চনের ঢোকা পর্যন্ত ব্যাক গ্রাউণ্ড মিউজিক দিয়ে নাটকের 'টেম্পো' ধরে রাখতে হবে। প্রত্যেক অভিনেতার এই সময় চলনেবলনে উত্তেজনা ও দ্রুততা থাকা আবশ্যক]